كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ "তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১০)

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً

অর্থঃ "একটি বাণী হলেও আমার নিকট থেকে (মানুষকে) পৌঁছে দাও।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

মূল

ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

শিক্ষক মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

অনুবাদকের আরজ

আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় কর্তব্য। হক্কানী ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন উপায়ে এই আদেশ ও নিষেধের উপর আমল করিতেছেন। তাছাড়া দাওয়াত ও তাবলীগের নামে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে উহার উপর আমল হইতেছে।

সাধারণভাবে মনে করা হয়– মানুষকে সত্য, কল্যাণ ও দ্বীনের পথে আহ্বান করার নামই "সৎ কাজের আদেশ" এবং পাপ, অকল্যাণ ও গোমরাহীর পথ হইতে বিরত থাকিতে বলার নামই "অসৎ কাজের নিষেধ"। অথচ ইসলামের এই মৌলিক ও গুরুত্ব পূর্ণ আমলটির আরো কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে কিনা এবং এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা ও দিক নির্দেশনা আছে কিনা, এই বিষয়ে আমাদের সকলেরই ধারণা অত্যন্ত সীমিত। সর্বকালের সেরা মুসলিম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) "আমরে বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার" শীর্ষক কিতাবে এইসব বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

"সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর উপর আমল করার যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজের ক্ষেত্রে কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক, এই কাজের ক্ষেত্র ও সীমা কতটুকু, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই কাজ ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ– ইত্যাদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নের প্রামাণিক জবাবসম্বলিত এই কিতাবটি ইমাম গায্যালীর এক অমূল্য অবদান। এই বিষয়ের উপর কোরআন-হাদীসের দলীলসহ এমন যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক কিতাব ইমাম গায্যালীর আগে বা পরে অপর কেহ রচনা করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সুতরাং কোন প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বলা চলে– সংশ্লিষ্ট প্রঙ্গের উপর ইহাই সর্বকালের সেরা কিতাব। ইতিপূর্বে ভারতের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা নামীদ আল ওয়াজেদী মূল শীরোনামে এই কিতাবটির উর্দু তরজমা করেন। আমরা উর্দু হইতে বাংলায় তরজমা করিয়া কিতাবটির নাম দিয়াছি "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"।

এমন একটি মূল্যবান কিতাবের বঙ্গানুবাদ বাংলাদেশী পাঠকদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আমরা আল্লাহ পাকের অশেষ শোকর আদায় করিতেছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে আমার জন্য আমার মাতাপিতা, পীর-উস্তাদ ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উসিলা করিয়া দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত–
মোহাম্মদ খালেদ
শিক্ষক, মাদীনাতুল উলূম মাদরাসা
কামরাঙ্গীর চর, আশরাফাবাদ
ঢাকা–১৩১০

তারিখ
১লা সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং
কুমিল্লাপাড়া, কামরাঙ্গীর চর
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

সূচীপত্র

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

পূর্বাভাষ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের একটি অন্যতম আমল। এই আমলের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্যই পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামগণের আগমন ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের বিধান মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে নবীগণের আগমনের ধারা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর এই দায়িত্ব ওলামায়ে কেরামের উপর অর্পিত হইয়াছে। মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে এই আমলের আবশ্যকতা কতটা গুরুত্ববহ এই প্রসঙ্গে কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট হইতে পারে যে, মানুষ যদি অবহেলা বশে এই আমল পরিত্যাগ করে, তবে দুনিয়াতে নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যহত হইয়া দ্বীনের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে চরম অবক্ষয় ও গোমরাহী ছড়াইয়া পড়িবে। দ্বীনের এই আহাম ও গুরুত্বপূর্ণ আমলের অনুপস্থিতির কারণে মানুষ ক্রমে আল্লাহর বিধান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাপাচার-অনাচার ও ফেৎনা-ফাসাদের কঠিন তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে এবং এক পর্যায়ে মানুষের অপরাধ অনুভূতি লোপ পাইয়া এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ আল্লাহ পাকের অসংখ্য নাফরমানী করিবার পরও উহাকে কোন অপরাধই মনে করিবে না।

বর্তমান সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের সেই আশংকাই বাস্তবে প্রমাণিত হইতেছে। দ্বীনের এই বুনিয়াদী আমল সম্পর্কে মানুষের ধারণা ক্রমেই লোপ পাইতেছে এবং কালক্রমে মানুষ ইহার আমল একেবারেই পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছে। মানুষ এখন সৃষ্টিকর্তা খালেকের বন্দেগী ত্যাগ করিয়া মানুষেরই গোলামী করিতে শুরু করিয়াছে। দ্বীনের ছহী সমঝ ও আমল হইতে দূরে সরিয়া পড়ার কারণেই মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এখন চতুস্পদ জন্তুর নিকৃষ্টতাকেও হার মানাইতেছে। ভূ-পৃষ্ঠে এমন সত্যিকার ঈমানদার নিতান্ত দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে,

যাহারা সব রকম বাঁধা-বিপত্তি ও প্রতিকুলতা উপেক্ষা করিয়া আল্লাহ পাকের বিধানের উপর কায়েম থাকিতে সচেষ্ট হইবে। এহেন নাজুক সময়ে যাহারা সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে দ্বীনের হাল ধরিয়া মানুষের মাঝে আবারো নবীওয়ালা আমল জারীর মেহনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিবে, তাহারা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে মহান পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিবে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মেহনত তথা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের আমলটি অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যবহ। আমরা এই বিষয়টিকে চারিটি পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করার প্রয়াস পাইব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গুরুত্ব ও ফজিলত

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে—

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ *

অর্থঃ "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যাহারা আহ্বান জানাইবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করিবে অন্যায় কাজ হইতে, আর তাহারাই হইল সফলকাম। (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১০৪)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা "সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ" এর উপর আমল করা মানুষের জন্য আবশ্যক হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আয়াতের বিবরণে আরো যেই কয়টি বিষয় প্রমাণিত হয় তাহা হইল, মানুষের কামিয়াবী ও সাফল্যকে বিশেষভাবে এই আমলের সহিত যুক্ত করিয়া বলা হইয়াছে, اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (তাহারাই হইল সফলকাম)। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর আমলটি ফরজে কেফায়া; ফরজে আইন নহে। মুসলমানদের একটি জামায়াত যদি এই আমল করে তবে অবশিষ্টগণ এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। কেননা, আয়াতে এইরূপ বলা হয় নাই যে, তোমরা সকলেই এই কাজ করিতে হইবে। বরং বলা হইয়াছে, তোমাদের মধ্য হইতে একদল মানুষের এই দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। অবশ্য এই কথা বলা হইয়াছে যে, সফলতা বিশেষভাবে সেইসব ব্যক্তিদেরই প্রাপ্য যাহারা এই দায়িত্ব পালন করিবে। কিন্তু সমাজের কেহই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে সকলকেই শাস্তি ভোগ

করিতে হইবে; বিশেষতঃ যাহাদের এই কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অবহেলা করিবে, তাহারা অবশ্যই অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

অন্য আয়াতে আছে–

لَيْسُوْا سَوَآءً ط مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُوْنَ * يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ ط وَ اُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ *

অর্থ ঃ "তাহারা সকলে সমান নহে। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তাহারা সেজদা করে। আর আল্লাহর প্রতি ও কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ হইতে বারণ করে এবং সৎ কাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। আর ইহারাই হইল সৎকর্মশীল।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১৩ – ১১৪)

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, কেবল আল্লাহ পাকের উপর বিশ্বাস করাই নেক আমল নহে; বরং আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারকেও উহার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

কালামে পাকের অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ *

অর্থঃ "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাহারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ হইতে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে।" (সূরা তওবাঃ আয়াত ৭১)

উপরোক্ত আয়াতে ইমানদারদের কতক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ইহাও আছে যে, তাহারা সৎ কাজের আদেশ করে। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, যাহাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান নহে, তাহারা মোমেনদের সেই দলের মধ্যে গণ্য হইবে না– যাহাদের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্য আয়াতে আছে–

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ * كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ *

অর্থঃ "বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কাফের তাহাদিগকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা অবাধ্যতা করিত এবং সীমা লংঘন করিত। তাহারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করিত না, যাহা তাহারা করিত। তাহারা যাহা করিত তাহা অবশ্যই মন্দ ছিল।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৮)

উপরোক্ত আয়াতে কঠোর ভাষায় বলা হইয়াছে যে, এমন লোকেরা অভিসপ্ত যাহারা সমাজে অন্যায়-অবিচার ছড়াইতে দেখিয়াও উহা দমন করার ব্যাপারে কোন ভূমিকা পালন করিত না।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং এই কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়া কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থঃ "তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে।" (সূরা আল ইমরানঃ আয়াত ১১০)

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖۤ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ *

অর্থঃ "অতঃপর যখন তাহারা সেই সব বিষয় ভুলিয়া গেল, যাহা তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছিল, তখন আমি সেইসব লোককে মুক্তি দান করিলাম যাহারা মন্দ কাজ হইতে বারণ করিত। আর পাকড়াও করিলাম গোনাহগারদিগকে নিকৃষ্ট আজাবের মাধ্যমে তাহাদের নাফরমানীর দরুন।"

(সূরা আ'রাফঃ আয়াত ১৬৫)

যাহারা মানুষকে মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করে, তাহাদের নাজাত ও মুক্তির কথা উপরোক্ত আয়াতে বিবৃত হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা এই কাজের আবশ্যকতাও প্রমাণিত হয়।

অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ *

অর্থঃ "তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান

করিলে তাহারা নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ৪১)

বস্তুতঃ আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলামের অন্যতম রোকন নামাজ ও রোজার পাশাপাশি এই আমলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ص وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ص

অর্থঃ "সৎ কর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করিও না।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ২)

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত সহযোগিতার অর্থ হইতেছে উৎসাহ যোগানো। অর্থাৎ যাহারা জানে তাহাদের কর্তব্য হইতেছে– যাহারা জানে না তাহাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা এবং এই পথের পথিকদিগকে সহযোগিতা করা। আর অন্যায়-অবিচারের কাজে সহযোগিতা না করার অর্থ হইতেছে– এমন সব পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া যাহা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ط لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ *

অর্থঃ "দরবেশ ও আলেমরা কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে এবং হারাম ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে না? তাহারা খুবই মন্দ কাজ করে।"

(সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ৬৩)

এই আয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরাধ চিহ্নিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিত না।

আল্লাহ পাক বলেন–

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ

অর্থঃ "কাজেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রহিল না, যাহারা পৃথিবীতে বিপর্য সৃষ্টি করিতে বাধা দিত।" (সূরা হুদঃ ১১৬)

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰى

اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ *

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাহাতে তোমাদের নিজের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও।" (সূরা নিসাঃ আয়াত ১৩৫)

সুতরাং পিতামাতা ও আত্মীয়বর্গের জন্য ইহাই হইতেছে সৎ কাজের আদেশ।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا *

অর্থঃ "তাহাদের অধিকাংশ সলা পরামর্শ ভাল নহে; কিন্তু যেই সলাপরামর্শ দান খয়রাত করিতে কিংবা সৎ কাজ করিতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করিত তাহা স্বতন্ত্র। যে এই কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তাহাকে বিরাট ছাওয়াব দান করিব। (সূরা নিসাঃ আয়াত ১১৪)

অন্যত্র বলা হইয়াছে-

وَ اِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا *

অর্থঃ "যদি মোমেনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে।" (সূরা হুজরাতঃ আয়াত ৯)

মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের অর্থ হইল, তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ হইতে বাধা দিয়া আনুগত্যের পথে ফিরাইয়া আনা। কিন্তু তাহারা যদি হক ও ন্যায়ের পথে রুজু করিতে অস্বীকার করিয়া নিজেদের অবাধ্যতার উপরই জমিয়া থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়া বলা হইয়াছে-

فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ *

অর্থঃ "তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে; যেই পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে।" (সূরা হুজরাতঃ আয়াত ৯)

আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস

একদা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) খোৎবা প্রদানকালে ফরমাইলেন, হে লোকসকল! তোমরা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ কর এবং উহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাক। আয়াতটি এই-

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ *

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রহিয়াছ তখন কেহ পথভ্রান্ত হইলে তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।" (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ১০৫)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

ما بين قوم عملوا بالمعاصي و فيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعل الا يوشك ان يعمهم بعذاب من عنده ٠

অর্থঃ "যেই কওম গোনাহ করে এবং তাহাদের মধ্যে গোনাহ হইতে নিষেধ করিতে সক্ষম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে নিষেধ না করে, তবে ইহা অসম্ভব নহে যে, আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের উপর আজাব নাজিল করিবেন।" (সুনানে আরবা')

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতে যেই যুগের কথা বলা হইয়াছে তাহা এখনো আসে নাই। কেননা, এখনো নসীহত করিলে মানুষ তাহা শোনে এবং পালনও করে। কিন্তু খুব শীঘ্রই এমন একটি সময় আসিবে যখন সৎ কাজের আদেশদাতাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইবে। তুমি কোন (ভাল) কথা বলিলে তাহা কেহই মানিবে না। তুমি যদি সেই যুগটি প্রাপ্ত হও, তবে এই আয়াতের উপর আমল করিবে এবং শুধু নিজেরই চিন্তা করিবে।

আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لتأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ٠

অর্থঃ "তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাদের উপর দুষ্ট লোকদিগকে চাপাইয়া দিবেন। তখন তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি দোয়া করিলেও তাহা কবুল করা হইবে না।" অর্থাৎ সাধারণ লোকদের অন্তরে বিশিষ্ট লোকদের কোন মর্যাদা থাকিবে না এবং তাহাদিগকে ভয় করিবে না। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

يا ايها الناس ان الله يقول لتأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر قبل ان

تدعوا فلا يستجاب لكم ·

অর্থঃ "হে লোকসকল! আল্লাহ পাক বলিতেছেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর, সেই দিন আসিবার পূর্বে, যখন তোমরা দোয়া করিবে আর তোমাদের দোয়া কবুল করা হইবে না।"

এক হাদীসে আছে–

ما اعمال البر عن الجهاد في سبيل الله الا كنفشة في بحر لجي و ما جميع اعمال البر والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الا كنفشة في بحر لجي ·

অর্থঃ "আল্লাহর পথে জেহাদ করার বিপরীতে সমস্ত নেক আমলের উপমা যেন গভীর সমুদ্রে একটি মাত্র ফুঁক। অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর বিপরীতে আল্লাহর পথে জেহাদ এবং সমস্ত নেক আমলের উপমা যেন গভীর সমুদ্রে একটি মাত্র ফুঁক।"

অন্য হাদীসে আছে–

ان الله تعالى يسأل العبد ما منعك اذ رايت المنكر فاذا لقن الله العبد حجته قال رب ! وثقت بك و فرقت من الناس ·

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন, মন্দ কাজে বারণ করা হইতে তোমাকে কিসে বিরত রাখিল? তখন যদি আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে জবাব শিখাইয়া দেন, তবে সে আরজ করিবে, পরওয়ারদিগার! আমি তোমার উপর ভরসা করিয়াছিলাম এবং মানুষকে ভয় করিয়াছিলাম। (ইবনে মাজা)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ তোমরা পথে উপবেশন করা হইতে বাঁচিয়া থাক। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকা আমাদের জন্য দুস্কর। কেননা, পথ হইল আমাদের মজলিস। আমরা তথায় উপবেশন করিয়া পরস্পরের সঙ্গে কথা বলি। এরশাদ হইলঃ তোমরা যদি পথের উপর বসিতেই চাও, তবে অবশ্যই পথের হক আদায় করিবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, পথের হক কি? তিনি এরশাদ করিলেনঃ দৃষ্টি নত রাখা, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, ছালামের জবাব দেওয়া এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। (বোখারী, মুসলিম)

এক হাদীসে আছে–

كل كلام ابن آدم عليه لا له الا امرا بمعروف و نهيا عن منكر او ذكر الله تعالى

অর্থঃ “সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং আল্লাহর জিঁকির ব্যতীত মানুষের সব কথাই ক্ষতিকর হইয়া থাকে– উপকারী হয় না।”

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছেঃ আল্লাহ পাক সাধারণ লোকদের গোনাহের কারণে বিশিষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দেন না। কিন্তু সাধারণ লোকেরা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি বিশিষ্ট লোকেরা বাধা না দেয়, তবে এই বিশিষ্ট লোকদের উপর আজাব নাজিল করা হয়। (আহমাদ)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

روي ابو امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كيف انتم طعى نساءكم و فسق شبائكم و تركتم جهادكم، قالوا : واذ لك كائن يا رسول الله ! قال نعم ! و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون، قالوا : و ما اشد منه يا رسول الله ؟ قال : كيف انتم اذا لم تأمروا بمعروف و لم تنهوا عن منكر، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم : و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون ، قالوا و ما اشد منه ؟ قال : كيف انتم اذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال : نعم، و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون قالوا و ما اشد منه ، قال : كيف انتم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف، قالوا : و كائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم و الذي نفسي بيده و اشد منه سيكون، يقول الله تعالي بي حلفت لا يتحن لهم فتنة بصير الحليم فيها خيرانا .

অর্থঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী হইতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে যখন তোমাদের স্ত্রীগণ অবাধ্যতা করিবে, যুবকরা কুকর্ম শুরু করিবে এবং তোমরা জেহাদ ছাড়িয়া দিবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! প্রকৃতপক্ষেই এমন অবস্থা হইবে কি? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ হাঁ! যেই আল্লাহর আয়ত্বে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম, এতদ্অপেক্ষাও গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদ্অপেক্ষা গুরুতর অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি এরশাদ করিলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা সৎ কাজের আদেশ করিবে না এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিবে না? জিজ্ঞাসা করা হইল, এমন অবস্থাও কি হইবে? জবাবে তিনি ফরমাইলেনঃ

হাঁ! সেই জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, ইহার চাইতেও মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহার চাইতেও মারাত্মক অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি বলিলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা ভাল কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভাল মনে করিবে? ছাহাবীগণ জানিতে চাহিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! এমনও হইবে কি? জবাবে তিনি ফরমাইলেনঃ যেই আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ, ইহার চাইতেও কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইহার চাইতেও কঠিন অবস্থা কি হইতে পারে? তিনি ফরমাইলেনঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হইবে, যখন তোমরা মন্দ কাজের আদেশ করিবে এবং ভাল কাজ করিতে নিষেধ করিবে? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! এমন অবস্থাও হইবে কি? এরশাদ হইলঃ ইহার চাইতেও কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। সেই জাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমি আমার শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহাদিগকে এমন ফেৎনায় নিপতিত করিব যে, তাহাদের বুদ্ধিমান লোকেরা সেই ফেৎনায় হতভম্ভ হইয়া যাইবে।

হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তোমরা তাহার নিকট দাঁড়াইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থাকে এবং উহার প্রতিবাদ না করে তাহার উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়। (অনুরূপভাবে) যাহাকে অন্যায়ভাবে প্রহার করা হয়, তাহার নিকটও দাঁড়াইও না। কেননা, যেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকিয়া জুলুমের প্রতিরোধ করে না, তাহার উপরও অভিশাপ বর্ষিত হয়।

(তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق · لا تكلم به فانه لن يقدم اجله و لن يحرمه رزقا هو له ·

অর্থঃ যেই ব্যক্তি এমন কোন স্থানে উপস্থিত থাকে যেখানে সত্য কথা বলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে সে যেন উহা হইতে বিরত না থাকে। কেননা, মৃত্যু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আসিবে না এবং যেই রিজিক তাহার ভাগ্যে আছে উহা হইতেও সে বঞ্চিত হইবে না। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে ইহা জানা গেল যে, জালেম ও ফাসেকগণের

ঘরে যাওয়া জায়েজ নহে এবং এমন স্থানেও যাওয়া উচিত নহে, যেখানে প্রকাশ্যে মন্দ কাজ চলিতেছে অথচ তাহার পক্ষে উহা বন্ধ করা, বাধা দেওয়া কিংবা ঘৃণা প্রকাশ করারও ক্ষমতা নাই। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে এমন ব্যক্তিদের উপর অভিশাপ বর্ষণের কথা উল্লেখ আছে, যাহারা জুলুমের স্থানে উপস্থিত থাকে এবং উহা প্রতিরোধ না করে। উহার প্রতিরোধে তাহার অক্ষমতা থাকিলেও সে এই অভিশাপের শিকার হইবে। এই কারণেই আমাদের কোন কোন পূর্ববর্তী বুজুর্গ লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেননা, তাহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এমন কোন লোকসমাগম নাই যেখানে অন্যায়-অপরাধ হইতেছে না আর তাহাদের পক্ষে উহা প্রতিরোধ করারও কোন ক্ষমতা ছিল না। এমতাবস্থায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনবাসই উত্তম।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, আজ আমরা যেই পরিস্থিতির শিকার, এই অবস্থার কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ নিজেদের বাড়ী-ঘর ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজন অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেননা, তাহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন, সমাজ হইতে সৎ কর্ম অন্তর্হিত হইয়া অনাচার ও পাপাচারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং মানুষকে সদুপদেশ প্রদান ও নসীহতের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমনকি কেহ সাহস করিয়া নসীহত করিলেও তাহাকে নানারূপ নির্যাতনের শিকার হইতে হইতেছে। এমতাবস্থায় তাহারা আশংকা করিয়াছেন, এই পাপাচারের অঙ্গনে অবস্থানের ফলে ফেৎনায় জড়াইয়া তাহারাও আল্লাহর আজাবের শিকারে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং তাহারা এহেন দুষ্ট লোকদের সঙ্গে বসবাস করার পরিবর্তে বনে-জঙ্গলে লতাপাতা খাইয়া হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে বসবাস করাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই বক্তব্য প্রদানের পর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন–

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ *

অর্থঃ "অতএব, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁহার তরফ হইতে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।" (সূরা জারিয়াতঃ আয়াত ৫০)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) বলেন, কতক লোক নিজেদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাওয়ার পর তাহাদের সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর ঘটনা শোনা গিয়াছে। নবুওয়্যতের মধ্যে যদি কোন ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব না থাকিত, তবে আমরা ইহাই বলিতাম যে, নবীগণ তাহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নহে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ফেরেশতাগণ তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাত ও মোসাফাহা করেন। আকাশের বাদল ও বনের হিংস্র প্রাণী তাহাদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সম্মুখে আসিয়া থামিয়া যায়। তাহারা ডাক দিলে সাড়া দেয়

এবং আজ কোথায় যাওয়ার হুকুম হইয়াছে, কোন্ ভূখণ্ডে বর্ষণ হইবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক ঠিক জবাব দেয়। অথচ তাহারা নবী ছিলেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

من حضر معصية كفرها فكأنه غاب عنها و من غاب عنها فاحبهما فكأنه حضرها ۰

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি কোন গোনাহের স্থানে উপস্থিত থাকে এবং উহাকে খারাপ মনে করে, তবে সে যেন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আর যেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত না হইয়াও ঐ গোনাহকে ভাল মনে করে, তবে সেই ব্যক্তি এমন যেন সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে।" (ইবনে আদী)

উপরোক্ত হাদীসের মর্ম হইতেছে– কোন ব্যক্তি যদি আবশ্যকীয় কোন প্রয়োজনে কোন গোনাহের স্থানে যায় কিংবা সে যখন গিয়াছে তখন সেখানে কোন গোনাহের অনুষ্ঠান ছিল না বটে, কিন্তু পরে ঘটনাক্রমে তাহা শুরু হইয়াছে, এই উভয় অবস্থায় তাহার কর্তব্য হইতেছে– নিজের হাত, জবান কিংবা অন্তর দ্বারা সেই গোনাহের প্রতি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করা। আর ইচ্ছাকৃতভাবে গোনাহের জায়গায় যাওয়া নিষেধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে যত নবী প্রেরণ করিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহাদের সহচরও ছিল। নবীগণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আপন সহচরদের মাঝে অবস্থান করিয়া আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার বিধানের উপর আমল করেন। অবশেষে আল্লাহ পাক যখন তাঁহার নবীকে উঠাইয়া লন, তখন নবীর সহচরগণ আল্লাহর কিতাব, তাঁহার হুকুম ও স্বীয় নবীর সুন্নত অনুযায়ী আমল করিতে থাকেন। নবীর এই সহচরগণ বিদায় হওয়ার পর এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা মিম্বরে বসিয়া এমন কথা বলিবে যাহা তাহারা জানে, আর (বাস্তব ক্ষেত্রে) তাহারা এমন আমল করিবে যাহা তাহারা জানে না। এই সম্প্রদায়টি দৃষ্টিগোচর হইলে তাহাদের সঙ্গে হাত দ্বারা জেহাদ করা ওয়াজিব হইবে। হাত দ্বারা সম্ভব না হইলে অন্তর দ্বারা জেহাদ করিবে। উহার পর ইসলামের কোন স্তর নাই।

একটি বস্তির ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একটি বস্তির ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, সেই বস্তির লোকেরা ব্যাপকভাবে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল।

তাহাদের মধ্যে কেবল চারজন এমন আবেদ ছিলেন যাহারা মানুষের এইসব পাপাচারকে ঘৃণা করিতেন। তাহারা এমন কামনা করিতেন যেন বস্তির লোকেরা আল্লাহর নাফরমানী ত্যাগ করিয়া সৎ পথে ফিরিয়া আসে। পরে তাহাদের একজন দ্বীন ও ঈমানের দাওয়াত লইয়া বস্তির লোকদের মাঝে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সকলকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ভাইসকল! তোমরা পাপাচার ও নাফরমানীর পথ পরিহার করিয়া আল্লাহ পাকের গোলামী ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু বস্তির পাপী লোকদের নিকট তাহার এই আহ্বান কোন ক্রিয়া করিল না এবং তাহারা সরাসরি এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিল। পরে তিনি কঠোর ভাষায় তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন কাজ হইল না। বরং জবাবে তাহারাও এই ব্যক্তির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি বস্তির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সংখ্যায় তাহারা অধিক ছিল বিধায় তাহাদেরই জয় হইল। অবশেষে তিনি মর্মাহত হৃদয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিবেদন করিলেন, আয় মাওলায়ে কারীম! আমি তাহাদিগকে পাপের পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা শোনে নাই। আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে জবাবে তাহারাও আমাকে তিরস্কার করিয়াছে। পরে আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম। কিন্তু লোকবল ও জনবলের আধিক্যের কারণে যুদ্ধে তাহারাই জয়ী হইয়াছে। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথে আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর দ্বিতীয় আবেদ বস্তিতে গিয়া দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা পাপের পথ পরিহার করিয়া ন্যায়-সত্য ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু বস্তির লোকেরা তাহার কথা মানিতে সরাসরি অস্বীকার করিল। তিনি তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় ভীতি প্রদর্শন করিলে জবাবে তাহারাও কঠোর ভাষা ব্যবহার করিল। অবশেষে তিনি ব্যর্থ হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পারওয়ারদিগার! আমি তাহাদিগকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমার আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। আমি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও কোন কাজ হয় নাই। আমি যদি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতাম তবে (জনবল ও সংখ্যাধিক্যের কারণে) তাহারাই আমার উপর জয়ী হইত। এই কারণে (আর সামনে অগ্রসর না হইয়া) আমি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর তৃতীয় আবেদ নিজের পূর্ববর্তীদের অনুসরণে দ্বীনের দাওয়াত লইয়া সেই বস্তিতে গেলেন। তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে বস্তিবাসীগণ! তোমরা যেই পথে চলিতেছ তাহা পাপের পথ। এই পথে চলিলে

তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর গোলামী ও শান্তির পথে ফিরিয়া আস। কিন্তু লোকেরা তাহার এই দাওয়াতে কোনরূপ কর্ণপাত করিল না। অতঃপর তিনিও পূর্ববর্তীদের ন্যায় তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহর দরবারে অনুযোগ করিলেন।

অবশেষে চতুর্থ ব্যক্তি সেই বস্তিবাসীদের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কয়েক কদম অগ্রসর হওয়ার পরই তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করিয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলেন, পরওয়ারদিগার! আমি যদি তাহাদিগকে দ্বীনের পথে আহ্বান করিতাম, তবে তাহারা আমার কথা শুনিত না। আমি তাহাদিগকে মন্দ বলিলে তাহারাও আমাকে মন্দ বলিত। তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে আমিই পরাজিত হইতাম। এই কারণে আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।

উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বর্ণিত চার ব্যক্তির মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মরতবা সর্বাধিক। আর তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির মর্যাদা সব চাইতে কম। কেননা, সে কেবল দাওয়াত দেওয়ার এরাদা করিয়াছিল, কিন্তু বস্তিবাসীদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত লইয়া যাওয়ার হিম্মত করিতে পারে নাই। কিন্তু তোমাদের মাঝে এই শেষোক্ত ব্যক্তির মত লোকও খুব কম হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিল, আয় আল্লাহর রাসূল! যেই বস্তিতে আল্লাহর নেক বান্দাগণ বিদ্যমান, উহাও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে কি? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, (সেই বস্তিও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে)। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, নেক বান্দাগণ আলস্যবশে আল্লাহর নাফরমানী দেখিয়াও নীরব থাকার কারণে।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন−

اوحى الله تبارك و تعالى الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا و كذا على اهلها فقال : يا رب ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين قال : اقلبها عليه و عليهم فان وجهه لم يتغير في ساعة قط ٠

অর্থঃ একদা আল্লাহ পাক এক ফেরেশতাকে আদেশ করিলেন, অমুক জনপদটি উহার অধিবাসীসহ উল্টাইয়া দাও। ফেরেশতা আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! সেই জনপদে আপনার এমন এক নেক বান্দা আছে, যিনি

মুহূর্তের জন্যও আপনার কোন নাফরমানী করে নাই। আল্লাহ পাক বলিলেনঃ তাহাকে এবং সকল অধিবাসীসহই জনপদটি উল্টাইয়া দাও। কেননা, অধিবাসীদের নাফরমানী দেখিয়া মুহূর্তের জন্যও তাহার চেহারা বিমর্ষ হয় নাই।

(তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

عذب اهل قرية فيها ثما نية عشر الفا عملهم عمل الانبياء قالوا : يا رسول الله ! كيف ؟ قال : لم يكونوا يغضبون الله و لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ٠

অর্থঃ একবার এমন এক বস্তির অধিবাসীদেরকে আজাব দেওয়ার আদেশ হইল, যাহাদের মধ্যে আঠার হাজার ব্যক্তি এমন ছিল, যাহাদের আমল ছিল পয়গম্বরগণের আমলের মত। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, (এত অধিক সংখ্যক আবেদ থাকার পরও) কি কারণে তাহাদের উপর আজাব হইল? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেনঃ তাহারা আল্লাহর (নাফরমানী দেখার) কারণে ক্রুদ্ধ হয় নাই এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিত না।

হযরত উরওয়া স্বীয় পিতা হইতে নকল করেন, একদা হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আপনার সব চাইতে প্রিয় বান্দা কে? এরশাদ হইল–

০ যেই ব্যক্তি আমার নির্দেশের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়, যেমন গাধা উহার শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

০ যেই ব্যক্তি আমার নেক বান্দাদের সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু তাহার মাতার বক্ষকে জড়াইয়া ধরে।

০ যেই ব্যক্তি আমার নিষিদ্ধ কাজে জড়িত ব্যক্তিদের উপর এমনভাবে ক্রুদ্ধ হয়, যেমন ব্যাঘ্র উহার প্রতিপক্ষের উপর ক্রুদ্ধ হয়। ব্যাঘ্র যখন উহার প্রতিপক্ষের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্ধত হয়, তখন সে ইহা হিসাব করিয়া দেখে না যে, তাহার শত্রুপক্ষ সংখ্যায় কম না বেশী।

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আয় আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন জেহাদ আছে কি? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেনঃ হাঁ! ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর পথে জেহাদকারীগণ বিদ্যমান। তাহারা জীবিত, রিজিকপ্রাপ্ত এবং দুনিয়াতে

তাহারা বিচরণ করে। আল্লাহ্ তায়ালা আকাশের ফেরেশতাদের সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে গর্ব করেন। তাহাদের জন্য জান্নাত সজ্জিত করা হয়। এইবার হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেনঃ হে আবু বকর! সেই সকল লোক হইল, যাহারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে এবং আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে মোহাব্বত করে ও শত্রুতা পোষণ করে।

অতঃপর তিনি আরো এরশাদ করিলেন, সেই মহান জাতের কসম যাহার আয়ত্বে আমার প্রাণ, তাহারা শহীদগণের কক্ষের উপরে অবস্থান করিবে। প্রতিটি কক্ষের তিন লক্ষ দরজা হইবে। কতক দরজা হইবে ইয়াকুত ও সবুজ পাল্লা নির্মিত। প্রতিটি দরজাতেই নূর থাকিবে। তাহাদের একজনের সঙ্গে তিন লক্ষ ডাগর নয়না হুরের বিবাহ হইবে। কোন হুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে তাহাকে অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া বলিবে– তোমার কি মনে পড়ে, অমুক দিন তুমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছিলে? এইভাবে সে তাহার নেক আমলসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।

হযরত ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বলেন, একবার আমি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, আয় আল্লাহর রাসূল আল্লাহ পাকের নিকট সব চাইতে উত্তম শহীদ কে? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, যেই বক্তি কোন জালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে আর এই কারণে সেই জালেম শাসক তাহাকে হত্যা করে। জালেম শাসক যদি তাহাকে হত্যা না করে তবে সে যত দিন জীবিত থাকিবে তাহার নামে কোন অপরাধ লেখা হইবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

افضل شهداء امتي رجل قام الي امام جائر فامر بالمعروف و نها عن المنكر فقتله على ذالك فذالك الشهيد منزلته في الجنة بين حمزة و جعفر ·

অর্থঃ আমার উম্মতের সবচাইতে উত্তম শহীদ সেই ব্যক্তি, যে জালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাকে সৎকাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করে আর এই অপরাধের কারণে সে তাহাকে হত্যা করে। জান্নাতে এই শহীদের মর্যাদা হামজা ও জাফরের মধ্যস্থলে হইবে।

www.eelm.weebly.com

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রসঙ্গে মহা মনীষীগণের উক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর দায়িত্ব পালন করিতে থাক। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর এমন জালেম শাসক চাপাইয়া দিবেন যে তোমাদের বড়দেরকে সম্মান করিবে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে না। তোমাদের পরহেজগার লোকেরা জালেম শাসকের জন্য বদদোয়া করিবে কিন্তু সেই বদদোয়া কবুল হইবে না। তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না।

একবার হযরত হোজাইফাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ব্যক্তি জীবিত হইয়াও মৃতদের মধ্যে গণ্য? জবাবে তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন মন্দ কাজ হইতে দেখিয়া তাহা হাত দ্বারা প্রতিহত করে না। কিংবা মুখে উহাকে খারাপ বলে না বা অন্তরেও ঘৃণা করে না।

হযরত মালেক ইবনে আহবার বলেন, বনী ইসরাঈলের এক আলেমের খেদমতে সর্বদা নারী-পুরুষের ভীড় লাগিয়া থাকিত। আর তিনি সমবেত লোকদিগকে দ্বীনের কথা শোনাইতেন এবং অতীতের জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দিতেন। এক দিন সেই আলেম দেখিতে পাইলেন, তাহার ছেলে উপস্থিত এক নারীর দিকে তাকাইয়া আছে এবং তাহাকে চোখে ইশারা করিতেছে। ছেলের এই আচরণটি ছিল অত্যন্ত গর্হিত। কিন্তু আলেম তাহার ছেলেকে কেবল বলিলেন, "এইরূপ করিও না" উহার অতিরিক্ত তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না)। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলেম নিজের আসন হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ একই সময় তাহার স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার ছেলে যুদ্ধে নিহত হইল।

এই সময় আল্লাহ্ পাক সেই যুগের পয়গম্বরের নিকট এই মর্মে ওহী প্রেরণ করিলেন যে, অমুক আলেমকে বলিয়া দিন, আমি তাহার ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যেও কোন নেককার পয়দা করিব না। কেননা, তাহার সকল কার্যক্রম যদি আমার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য হইত, তবে তাহার ছেলের সেই অন্যায় আচরণের জন্য কেবল এতটুকুই বলিত না যে, এইরূপ করিও না। বরং উহার জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিত।

হযরত হোজাইফা (রাঃ) বলেন, এমন একটি সময় আসিবে যখন লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দানকারী এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিদের

তুলনায় মৃত গাধাকে উত্তম মনে করিবে।

আল্লাহ পাক হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমি আপনার কওমের চল্লিশ হাজার ভাল লোককে এবং ষাট হাজার মন্দ লোককে ধ্বংস করিয়া দিব। এই বাণী শুনিয়া হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করিলেন, পরওয়ারদিগার! মন্দ লোকেরা ধ্বংস হইয়া যাওয়ার কারণ তো স্পষ্ট, কিন্তু ভাল লোকেরাও কি কারণে মন্দ লোকদের পরিণতি বরণ করিবে তাহা বোধগম্য নহে। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হইতে জবাব আসিল- উহার কারণ এই যে, ভাল লোকেরা মন্দ লোকদের (পাপকর্ম) দেখিবার পরও তাহাদের) উপর অসন্তুষ্ট হইত না এবং (স্বাভাবিকভাবেই) তাহাদের সঙ্গে খানাপিনা (ও চলাফিরা) করিত। আমার সঙ্গে যদি ভাল লোকদের সামান্য সম্পর্কও থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা মন্দ লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিত।

হযরত বিলাল ইবনে সা'দ বলেন, কোন ব্যক্তি যখন গোপনে নাফরমানী করে, তখন উহা দ্বারা কেবল সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই নাফরমানী যখন প্রকাশ্যে করা হয় আর উহাতে কেহ বাধা না দেয়, তখন উহা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যাহারা এই নাফরমানী দেখিয়া নীরবতা অবলম্বন করে, তাহারাও উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একদা হযরত কা'বুল আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কওমে আপনার অবস্থান কেমন? তিনি বলিলেন, আমার কওম আমাকে অত্যন্ত সম্মান করে। হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে কিন্তু এই বিষয়ে ভিন্ন রকম মন্তব্য লিখিত আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাওরাতে কি লিখিত আছে? হযরত কা'ব বলিলেন, উহাতে লিখিত আছে, যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর আমলে নিযুক্ত থাকিবে কওমের মধ্যে তাহার কোন মর্যাদা থাকিবে না এবং লোকেরা তাহাকে ভাল নজরে দেখিবে না। বরং তাহার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হইবে। এইবার হযরত আবু মুসলিম খাওলানী বলিলেন, তাওরাত কিতাবে সত্য লিখিত আছে এবং আবু মুসলিম মিথ্যাবাদী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) দাওয়াত ও নসীহতের উদ্দেশ্যে হুকুমতের আমলাদের নিকট তাশরীফ লইয়া যাইতেন। কিছু দিন পর হঠাৎ তিনি এই কার্যক্রম বন্ধ করিয়া দিলেন। লোকেরা উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার এই আমলের কারণে লোকেরা হয়ত মনে করিবে, আমার কথা ও কাজে বৈপরীত্য বিদ্যমান। আর আমি যদি তাহাদিগকে কিছুই

না বলি, তবে আমি "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" বর্জনকারী

বলিয়া সাব্যস্ত হইব এবং উহার ফলে আমি গোনাহগার হইব।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, যেই ব্যক্তি "আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার" করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে এমন স্থানে অবস্থান করা ঠিক নহে; যেখানে উহার উপর আমল করা আবশ্যক হয়।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) বলেন, তোমাদের নিকট প্রথম যেই জেহাদের কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে তাহা হইল হাতের জেহাদ। অতঃপর মুখের জেহাদ এবং সব শেষে অন্তরের জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মানুষের অন্তর যদি ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ মনে না করে, তবে তাহাকে উপুড় করিয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে সত্যের আলো ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে কঠিন অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়।

হযরত সহল ইবনে তশতরী (রহঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি অপরকে কিছু বলার ক্ষমতা রাখে না, সে যদি নিজের ব্যক্তিজীবনে আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ পাবন্দির সহিত পালন করে এবং অপরকে পাপকর্ম করিতে দেখিয়া অন্তর দ্বারা উহাকে ঘৃণা করে, তবে মনে করা হইবে– সে যেন অপরাপর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করিল।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন না কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, অনেকে এই কাজ করিতে গিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর উপর আমল করার কারণে তাহাদের উপর যেই নির্যাতন করা হইয়াছে, উহাতে তাহারা ধৈর্য ধারণ করিতে পারে নাই।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে এই একই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, সমুদ্র যখন উহার রোখ পরিবর্তন করিয়া ধাবিত হয়, তখন উহার বিপরীতে দাঁড়াইয়া উহার গতি রোধ করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, মুসলমানদের পক্ষে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব। শক্তি ও ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এই দায়িত্ব এড়াইবার কোন উপায় নাই। তবে এই আমল সম্পাদন করিতে যাহার শক্তি ও ক্ষমতা নাই; এই ক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্যই অক্ষম মনে করা হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদেশ ও নিষেধের শর্ত

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের গোটা আমলটি মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত–

১. মুহতাসিব (আদেশ ও নিষেধকারী)।

২. মুহ্তাসিব আলাইহি (যাহাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়)।

৩. মুহ্তাসিব ফীহি (যেই বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয়)।

৪. ইহ্তিসাব (স্বয়ং আদেশ ও নিষেধ)।

প্রথম শর্তঃ মুকাল্লাফ হওয়া

মুহতাসিব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর প্রথম শর্ত হইল "মুকাল্লাফ" বা শরীয়তের বিধিবিধান পালনে যোগ্য হওয়া। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধসম্পন্ন হওয়া। কেননা, "গায়রে মুকাল্লাফ" তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বোধহীন ব্যক্তির পক্ষে শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নহে। এখানে স্মরণ রাখিবার বিষয় হইল, এই পর্যায়ে যেই শর্তের কথা বলা হইতেছে, তাহা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত– কেবল জায়েজ হওয়ার নহে। অর্থাৎ একজন বোধসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করা জরুরী। এই কারণেই এই কাজের জন্য বোধসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কেননা, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই এই কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। তো এই কাজের জন্য বালেগ ও প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া জরুরী নহে। সুতরাং যেই বালক ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে সে মুকাল্লাফ না হইলেও তাহার পক্ষে অসৎ কাজের নিষেধ করা জায়েজ। যেমন শরাবের পাত্র মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া বা খেলাধুলার সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা ইত্যাদি। এইরূপ করিলে সে ছাওয়াবের পাত্র হইবে এবং এই কাজে তাহাকে বাধা দেওয়া জায়েজ হইবে না। অর্থাৎ তাহাকে এইরূপ বলিয়া বারণ করা যাইবে না যে, "তুমি তো এখনো মুকাল্লাফ নও, সুতরাং কি কারণে তুমি অসৎ কাজের নিষেধ করিতেছ?" কারণ এই যোগ্যতা তাহার মধ্যে ঈমানের কারণে হাসিল হইয়াছে– প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সুবাদে নহে। সুতরাং তাহার পক্ষে বড়দের মতই কোন কাফেরকে হত্যা করা এবং তাহার অস্ত্র ও মালামাল ছিনাইয়া লওয়া জায়েজ। তবে শর্ত হইল এই কাজে যেন কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার শিকার হওয়ার আশংকা না থাকে।

দ্বিতীয় শর্তঃ মোমেন হওয়া

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য মোমেন হওয়ার শর্তটি স্পষ্ট। কেননা, দ্বীনের মদদ-নুসরত এবং দ্বীনকে সমুন্নত রাখার অপর নামই হইতেছে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ"। সুতরাং যেই ব্যক্তি মোমেন নহে এবং দ্বীনকে অস্বীকার করে, তাহার পক্ষে এই কাজের যোগ্য হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

তৃতীয় শর্তঃ আদেল হওয়া

কাহারো কাহারো মতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য 'আদেল' (কবীরা গোনাহ হইতে মুক্ত) হওয়া শর্ত। তাহারা মনে করেন, একজন ফাসেক ও পাপাচারীর পক্ষে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার অধিকার নাই। কেননা, যেই ব্যক্তি নিজে আল্লাহর নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত; সে কেমন করিয়া অপরকে সৎ কাজের নসীহত করিবে?

প্রথম দলীল

উপরোক্ত প্রসঙ্গে প্রথম দলীল হিসাবে তাহারা পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করিয়াছেন–

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ *

অর্থঃ "তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাও।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ৪৪)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ *

অর্থঃ "তোমরা যাহা কর না, তাহা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।" (সূরা ছফঃ আয়াত ৩)

দ্বিতীয় দলীল

দ্বিতীয় দলীল হিসাবে তাহারা নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন–

مررت ليل اسرى بي بقوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من انتم. فقالوا كنا نأمر بالخير و لا نأتيه و تنهى عن الشر و نأتيه .

অর্থঃ "মেরাজের রাতে আমি এমন কতক লোকের নিকট দিয়া গিয়াছি, যাহাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হইতেছিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের পরিচয় কি? জবাবে তাহারা বলিল, আমরা সৎ

কাজের আদেশ করিতাম কিন্তু নিজেরা তাহা করিতাম না। অপরকে মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করিতাম কিন্তু নিজেরা উহাতে লিপ্ত থাকিতাম।"

তৃতীয় দলীল

একদা আল্লাহ পাক হযতর ঈসা (আঃ)-এর উপর এই মর্মে ওহী নাজিল করিলেন যে, হে ঈসা! আপনি প্রথমে নিজের নফসকে নসীহত করুন। আপনার নফস যখন সেই নসীহত মানিয়া উহার উপর আমল শুরু করিবে, তখন অপরকে নসীহত করুন। অন্যথায় আমাকে লজ্জা করুন।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে যাহারা "আদেল" হওয়া অবশ্যক মনে করেন, তাহাদের মতে সাধারণ কেয়াস ও মানবীয় বিচার-বুদ্ধিও এই কথাই বলে যে, এই ক্ষেত্রে 'আদেল' শর্ত হওয়া আবশ্যক। কেননা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মূল কথা হইল– অপরকে সৎ পথ দেখানো। সুতরাং অপরকে সৎ পথ প্রদর্শন করিতে হইলে আগে নিজে সৎ পথে চালিত হইতে হইবে।

'আদেল' এর শর্ত আবশ্যক নহে

উপরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে 'আদেল' শর্ত হওয়া সংক্রান্ত এক শ্রেণীর লোকের ধারণার উপর আলোচনা করা হইল। কিন্তু আমরা এই ধারণার পরিপন্থী। আমাদের বিশ্বাস হইল, ফাসেক ও গোনাহগার ব্যক্তিও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে পারিবে। কেননা, যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, আদেশ ও নিষেধকারী ব্যক্তি যাবতীয় কবীরা গোনাহ হইতে পাক হইতে হইবে, তবে উহার অর্থ হইবে, আদেশ ও নিষেধের পথ একবারেই রুদ্ধ করিয়া দেওয়া। কারণ, এইরূপ নিষ্পাপ লোকও পাওয়া যাইবে না এবং আদেশ-নিষেধের কাজও আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হইবে না। কেননা, ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগের পুণ্যাত্মা ছাহাবায়ে কেরামের যুগেও এইরূপ নিষ্পাপ লোক পাওয়া যায় নাই; সুতরাং পরবর্তী যুগে আদেশ-নিষেধের জন্য এইরূপ নিষ্পাপ মানুষ পাওয়া তো একেবারেই অসম্ভব। এই কারণেই হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের জন্য যদি 'আদেল' হওয়া শর্ত লাগানো হয়, তবে এই বিষয়ের উপর আমল করা কাহারো পক্ষেই সম্ভব হইবে না। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) হযরত সাঈদের এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইল, ফাসেক ও গোনাহগারদিগকে আদেশ ও নিষেধ হইতে বিরত রাখার পক্ষপাতীগণ যেই আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন, উহাতে কি কথা ও কাজের বৈপরীত্যের নিন্দা করা হইয়াছে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, বর্ণিত আয়াতে কথা ও কাজের বৈপরীত্যের নিন্দা

করা হয় নাই। বরং আলোচ্য আয়াতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এমন বোকামীপূর্ণ আচরণের নিন্দা করা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেরা যেই সৎ কাজের উপর আমল করে না, অপরকে সেই কাজের আদেশ করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে নিজেদের এলেম থাকার কথা প্রকাশ করিতেছে। অথচ বাস্তব অবস্থা হইল, যেই ব্যক্তি আলেম, সে সৎ কাজ বর্জন করিলে তাহার শাস্তি অধিক হয়। কেননা, এলেম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি আমল করা না হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার নিকট কোন সঙ্গত ওজর থাকে না। মোটকথা, বর্ণিত আয়াতে ভাল কাজ বর্জন করার নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। আদেশ করার নিন্দা করা হয় নাই।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *

অর্থঃ "তোমরা যাহা কর না, তাহা কেন বল"? আসলে এই আয়াতে এমন লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে যাহারা ওয়াদা খেলাফী করে। অনুরূপভাবে وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ (তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ভুলিয়া যাও) আয়াতে এমন লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে যাহারা গাফলতের মধ্যে লিপ্ত হইয়া নিজেদের এছলাহের ফিকির করে না। অর্থাৎ এখানে এই কারণে তাহাদের নিন্দা করা হয় নাই যে, তাহারা অপরাপর মানুষের এছলাহ ও আত্মসংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতেছে। এতদ সত্ত্বেও অপর লোকদের প্রসঙ্গ এই কারণে উত্থাপন করা হইয়াছে যেন এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের মধ্যে সৎ কাজ ও অসৎ কাজের এলেম আছে এবং এই এলেম থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের ব্যাপারে অবহেলা করিতেছে। এইরূপ অবহেলার শাস্তি কঠিন।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আল্লাহ পাকের এরশাদ "প্রথমে নিজেকে উপদেশ দিন" দ্বারা মৌখিক আদেশ ও নিষেধের কথা বলা হইয়াছে। এই কথা আমরাও স্বীকার করি যে, একজন পাপী লোকের মৌখিক উপদেশ এমন লোকদের জন্য উপকারী হয় না, যাহারা তাহার পাপাচার সম্পর্কে অবগত। এই বিবরণের শেষে বলা হইয়াছে, "আমাকে লজ্জা করুন"। সুতরাং ইহা দ্বারা অপরকে উপদেশ দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয় না। বরং ইহার অর্থ হইতেছে– অধিক জরুরী বিষয় (নিজের আত্মসংশোধন) ত্যাগ করিয়া কম জরুরী বিষয় (অপরের সংশোধন)-এর পিছনে মশগুল হইও না।

চতুর্থ শর্তঃ শাসন কর্তার অনুমতি

কাহারো কাহারো মতে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের জন্য শাসনকর্তার পক্ষ হইতে অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। তাহাদের মতে প্রজা সাধারণের কাহারো পক্ষেই শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া এই কাজ করার

অধিকার নাই। কিন্তু আমাদের মতে এই শর্ত ঠিক নহে এবং ইহা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের ফজিলত এবং মুসলমানদের উপর এই আমলটি ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা যেই সকল আয়াত ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা জানা যায়, যেই ব্যক্তি কোন মুনকার বা অপরাধকর্ম দেখিয়া চুপ থাকিবে সে গোনাহগার হইবে। কেননা, কুকর্ম যেখানেই এবং যেই অবস্থায়ই দেখা হউক, উহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

ইহতিসাবের পাঁচটি স্তর

ইহ্তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে। যথা–

(এক) তা'রীফ। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করা।

(দুই) মানুষকে দরদ ও মোহাব্বতের সহিত নসীহত করা।

(তিন) তিরস্কারের ভাষায় নসীহত করা। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, মানুষের প্রতি গালাগাল বা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করিবে। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হে নির্বোধ! তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? অর্থাৎ এই জাতীয় অন্য কোন শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(চার) মানুষকে জোরপূর্বক কোন কাজ হইতে বিরত রাখা। যেমন কাহারো যদি শক্তি থাকে তবে শরাবের পাত্র বা খেল-তামাশার সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা, রেশমী কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলা কিংবা ছিনতাইকৃত মালামাল উদ্ধার করিয়া প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি।

(পাঁচ) ধমকানো বা মারধোর করিয়া তাহাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলা। এই পরিমাণ প্রহার করা যেন উহার ফলে সে যেই অপরাধে লিপ্ত ছিল তাহা ছাড়িয়া দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত মানুষের গীবত শেকায়েত করিতেছে বা কোন মানুষের নামে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিতেছে কিংবা কাহাকেও গালি দিতেছে। আর এই সব কর্ম তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার মুখ তো একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে না বটে, তবে কয়েক ঘা লাগাইয়া আপাততঃ তাহাকে নিরস্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য এই পঞ্চম স্তরটি কিছুটা নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ বটে। কেননা, এই ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টি হইয়া উভয় পক্ষে খুনাখুনি হওয়ার উপক্রম হইতে পারে বিধায় এই ক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক হইবে। এই প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মোটকথা, উপরে বর্ণিত পাঁচটি স্তরের প্রথম চারিটিতে ইমাম ও শাসকের অনুমতি আবশ্যক নহে। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন, দরদ ও মোহাব্বতের

ভাষায় নসীহত করা এবং কোন ফাসেক ও বদকারকে তাহার অপরাধের জন্য তিরস্কার করা কিংবা কোন আহাম্মক ও নির্বোধকে তাহার বোকামী নির্দেশ পূর্বক সুপথে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা করা– ইত্যাদি প্রশ্নে শাসনকর্তার অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা, এইসব প্রসঙ্গ হইল হক কথার মধ্যে শামিল। আর হক কথার দাবী হইল তাহা নির্দ্বিধায় বলিতে হইবে। হাদীসে পাকে তো জালেম শাসনকর্তার মুখের উপর সত্য কথা বলাকে সর্বোত্তম জেহাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং যেখানে খোদ শাসনকর্তার সম্মুখেই সত্য কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে অন্যদের বেলায় সত্য কথা বলিতে শাসনকর্তার অনুমতি লওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

সুতরাং আমাদের আকাবেরে দ্বীন ও পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ সর্বদা শাসকদের সম্মুখে অকপটে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলে এই বিষয়টি এজমা ও সর্বসম্মতভাবেই প্রমাণিত যে, সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে শাসকদের অনুমতি আবশ্যক নহে।

কথিত আছে যে, একবার মারওয়ান ঈদের নামাজের পূর্বে খোৎবা পাঠ করিতেছিলেন। এক ব্যক্তি উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, ঈদের খোৎবা তো নামাজের পরে পড়া হয়। মারওয়ান সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ হইয়া লোকটিকে শাসাইয়া দিল। সেই জামায়াতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি মারওয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রতিবাদী লোকটি সত্য মাসআলা প্রকাশ করিয়া নিজের কর্তব্য আদায় করিয়াছে। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায় কর্ম করিতে দেখিলে তাহার কর্তব্য হইবে– উহাকে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা। যদি হাত দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তবে মুখে উহার প্রতিবাদ করিবে। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে মনে মনে উহাকে ঘৃণা করিবে। আর ইহা হইল ঈমানের দুর্বলতম স্তর। পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ এইভাবেই শাসক শ্রেণীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা তাহারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা সকলেই সমান।

অন্যায়ের প্রতিবাদে বুজুর্গানে দ্বীনের সাহসিকতার কয়েকটি ঘটনা

খলীফা মাহদী মসনদে সমাসীন হওয়ার পর একবার তিনি মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করার পর একদিন বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিতে আসিলেন। এই সময় তাহার লোকজন বাইতুল্লাহর আশপাশ হইতে সকলকে সরাইয়া মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা) খালী করিয়া দিল। অতঃপর তিনি তাওয়াফ শুরু করিলেন। অদূরে উপবিষ্ট আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক

এই দৃশ্য দেখিয়া খলীফার সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহার চাদরের প্রান্ত সজোরে টানিয়া ধরিয়া বলিলেনঃ দেখ, তুমি কি করিতেছ? তোমাকে এই ঘরের অধিক হকদার কে বানাইয়াছে যে, এখানে আগত লোকদিগকে তুমি বাধা দিতেছ? অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَ الْبَادِ

অর্থঃ "এই গৃহে স্থানীয় ও বহিরাগত সকলে সমান।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ২৫)

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হইয়া খলীফা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন এবং সহসা কিছুই বলিতে পরিলেন না। কেননা, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। কিন্তু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক? হযরত আব্দুল্লাহ নির্ভিক ও ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ! আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক। খলীফা তাহার আচরণে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়াছিলেন। এইবার তাহার স্পষ্ট কথনে পূর্বাধিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রেফতার করতঃ বাগদাদে পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের উপরোক্ত আচরণটি খলীফার দৃষ্টিতে যারপর নাই শাস্তিরযোগ্য ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাহাকে এমন কোন শাস্তি দেওয়া মোনাসেব মনে করিলেন না, যাহাতে সাধারণ মানুষের নিকট তাহার কোনরূপ অবমাননা হয়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাহাকে ঘোড়ার আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখার নির্দেশ দিলেন, যেন ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করেন। অতঃপর এই উদ্দেশ্যে একটি অবাধ্য ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের ঘোড়াকে তাহার নিকট বাঁধিয়া রাখা হইল। কিন্তু আল্লাহ পাক ঘোড়ার স্বভাব পরিবর্তন করিয়া উহাকে তাহার বশীভূত করিয়া দিলেন। ফলে খলীফার এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তিনি কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন না। খলীফা এই ব্যবস্থায় ব্যর্থ হইয়া পরে তাহাকে একটি অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করিয়া উহার চাবি নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তিন দিন পর দেখা গেল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুক কারাগারের অদূরে একটি বাগানে মুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া ফিরিয়া লতাপাতা খাইতেছেন। বাগানের মালিকের মাধ্যমে খলীফা এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই অবাক হইলেন। তিনি সন্ধান লইয়া ইহাও জানিতে পারিলেন যে, কয়েদখানাটি আগের মতই তালাবদ্ধ আছে এবং তথা হইতে বন্দী পালাইয়া যাওয়ার বাহ্যিক কোন আলামতও পাওয়া যাইতেছে না। আর কয়েদখানার সেই চাবিটিও তাহার নিকটই রক্ষিত আছে। পরে তিনি কয়েদীকে দরবারে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কয়েদখানা হইতে কে বাহির করিয়াছে? তিনি বলিলেন, যিনি আমাকে বন্দী করিয়াছেন। খলীফা

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কে বন্দী করিয়াছে? এইবারও তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। খলীফার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুকের এইসব জবাব অত্যন্ত হেয়ালীপূর্ণ মনে হইল এবং তিনি বিচলিত হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, হে ইবনে মারজূক! তোমার কি মৃত্যুর ভয় নাই? আমি তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। এইবার তিনি পূর্বাধিক অবিচল কণ্ঠে জবাব দিলেন, জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা যদি তোমার মর্জি অনুযায়ী হইত, তবে অবশ্যই তোমাকে ভয় করিতাম। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের কোনটিতেই তোমার কিছুমাত্র হাত নাই; সুতরাং এই বিষয়ে তোমাকে ভয় করিবারও কোন কারণ নাই।

উপরোক্ত ঘটনার পর খলীফা মাহদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মারজুককে বন্দী করিয়া রাখেন। অবশেষে খলীফার মৃত্যুর পর লোকেরা তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনে। হযরত ইবনে মারজুক বন্দী অবস্থায় মান্নত করিয়াছিলেন, আল্লাহ পাক যদি তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করেন, তবে তিনি একশত উট কোরবানী করিবেন। মুক্তি লাভের পর মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই মান্নত পূরণ করেন।

এক বুজুর্গ কর্তৃক খলীফার বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলার ঘটনা

হাব্বান ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ তাহার খাদেম বনী হাশেমের সোলাইমান ইবনে আবু জাফরকে সঙ্গে লইয়া সফরে বাহির হইলেন। সফরের এক পর্যায়ে খলীফা খাদেমকে বলিলেন, তোমার নিকট তো একজন চমৎকার গায়িকা বাঁদী ছিল, তাহার গজল ও কণ্ঠস্বরের বেশ সুখ্যাতি শুনিয়াছি। তাহাকে আনার ব্যবস্থা কর, আমি তাহার গজল শুনিব। পরে বাঁদীকে আনার ব্যবস্থা করা হইল এবং যথা সময় সে গজল পরিবেশন করিল। কিন্তু খলীফার নিকট তাহার গজল মোটেও ভাল লাগিল না এবং তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বাঁদীকে বলিলেন, আজ তোমার কি হইয়াছে, গজল জমিতেছে না কেন? ইতিপূর্বে তো তোমার কণ্ঠ বেশ ভাল ছিল। বাঁদী সবিনয়ে আরজ করিল, মহামান্য আমীরুল মোমেনীন! আজ যেই বাদ্যযন্ত্রটির মাধ্যমে আমি গজল পরিবেশন করিলাম, সেইটি আমার নহে। এই কারণেই আমি উহার সহিত তাল মিলাইয়া সুর তুলিতে পারিতেছি না। খলীফা সঙ্গে সঙ্গে খাদেমকে হুকুম দিলেন যেন এখুনি বাঁদীর বাদ্যযন্ত্রটি লইয়া আসা হয়। খাদেম ছুটিয়া গিয়া বাঁদীর বাড়ী হইতে তাহা লইয়া আসিতেছিল। পথে এক জায়গায় সে দেখিতে পাইল, এক বৃদ্ধ খেজুরের আঁটি কুড়াইতেছেন। খাদেমের পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলেন, খাদেমের হাতে

একটি বাদ্যযন্ত্র। বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে খাদেমের হাত হইতে উহা ছিনাইয়া লইয়া মাটিতে আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় খাদেম একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরে সে মহল্লার হাকিমের নিকট গিয়া ঘটনার বিবরণ দিয়া বৃদ্ধকে বন্দী করিয়া রাখিতে বলিল। হাকীমকে সে এই কথাও জানাইয়া দিল যে, এই ব্যক্তি স্বয়ং খলীফার কাজে বাধা দিয়াছে। কিন্তু হাকীম বৃদ্ধকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন এবং তাঁহার বুজুর্গী সম্পর্কেও ওয়াকেফ ছিলেন। সুতরাং তিনি ইহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, তিনি এই মহান ব্যক্তিকে কেমন করিয়া বন্দী করিবেন। কিন্তু কথিত অপরাধটি যেহেতু স্বয়ং খলীফার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এই কারণে তিনি একান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

পরে খাদেম ফিরিয়া আসিয়া খলীফাকে ঘটনার বিবরণ শোনাইলে তিনি রাগে-ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় সোলাইমান বিন জাফর খলীফাকে বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আপনি উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ নাই; আপনি বরং মহল্লার হাকীমকে নির্দেশ দিয়া পাঠান যেন বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ দজলা নদীতে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু খলীফা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি প্রথমে বৃদ্ধকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, সে কেমন করিয়া এমন দুঃসাহসিক কর্ম করিল।

পরে খলীফার সংবাদবাহক বৃদ্ধের নিকট গিয়া শাহী দরবারে হাজির হওয়ার ফরমান শোনাইলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অম্লান বদনে শাহী দূতের সঙ্গে রওনা হইলেন। দূত তাহাকে সওয়ারীতে আরোহণ করিতে বলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিলেন। শাহী মহলের বহির্ফটকে আসিয়া হাজির হওয়ার পর দূত ভিতরে গিয়া খলীফাকে সংবাদ দিল যে, আসামী হাজির হইয়াছে।

খলীফার কক্ষে তখন একটি বাদ্যযন্ত্র মওজুদ ছিল, তিনি উপস্থিত সভাসদগণের মতামত জানিতে চাহিলেন যে, বৃদ্ধকে এখানেই আনিয়া হাজির করা হইবে কিনা। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, বৃদ্ধকে এখানে আনা ঠিক হইবে না। কেননা, সে হয়ত বাদ্যযন্ত্রটি দেখিয়া আগের মতই আচরণ করিয়া বসিতে পারে। পরে খাদেমকে বলা হইল যেন তাহাকে অন্য কক্ষে ডাকিয়া আনা হয়। খাদেম গিয়া তাহাকে বলিল, তোমার খর্জুর আঁটির পুটুলীটি এখানেই রাখিয়া খলীফার নিকট চল। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই তাহার পুটুলী রাখিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, ইহা আমার রাতের খাবার। খলীফার লোকেরা তাহাকে বলিল, রাতে তোমার আহারের ব্যবস্থা আমরাই করিব। কিন্তু বৃদ্ধ এই প্রস্তাবও ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, রাজবাড়ীর খাবারে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

এদিকে খলীফা এই বিতর্কের কথা জানিতে পারিয়া নিজেই সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া পুটুলীসহই বৃদ্ধকে ভিতরে লইয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন। সেমতে বৃদ্ধকে খলীফার সম্মুখে হাজির করা হইল। এই সময় তাহার চেহারায় ভয়-আতঙ্ক বা দুর্ভাবনার কিছুমাত্র লক্ষণ ছিল না। খলীফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় মিয়া! তুমি কেমন করিয়া এমন গুরুতর অন্যায় করিলে? বৃদ্ধ পাল্টা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি অন্যায় করিয়াছি? কিন্তু খলীফা "তুমি আমার বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছ" এই কথা কিছুতেই মুখে আনিতে পারিলেন না। সুতরাং কয়েকবার একই প্রশ্ন করিবার পর বৃদ্ধও অনুরূপ পাল্টা প্রশ্ন করিলেন। অবশেষে বৃদ্ধ নিজেই বলিলেন, আমি আপনার পিতৃপুরুষকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া এই আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি—

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۔

অর্থঃ "আল্লাহ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ, এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করিতে বারণ করেন।" (সূরা নাহলঃ আয়াত ৯০)

সুতরাং আমি আপনার খাদেমের নিকট অসঙ্গত কাজের একটি যন্ত্র দেখিয়া তাহা ভঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। কেননা, আমাদিগকে উহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃদ্ধের মুখে এই জবাব শুনিয়া খলীফা হারুনুর রশীদ একেবারে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ শাহী মহল ত্যাগ করিবার পর খলীফা খাদেমের নিকট একটি থলে দিয়া বলিলেন, তুমি বৃদ্ধের পিছনে গিয়া দেখ, সে লোকজনের নিকট আজিকার ঘটনা লইয়া কোন আলোচনা করে কিনা। যদি এই বিষয়ে সে কাহারো সঙ্গে কোন রূপ আলোচনা না করে, তবে এই থলেটি তাহাকে দিয়া দিও। আর যদি কিছু বলে, তবে ইহা ফেরৎ লইয়া আসিও। খাদেম বৃদ্ধের পিছনে গিয়া দেখিল, সে কাহারো সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া নীরবে পথ চলিতেছে। পরে তিনি একটি খেজুরের আঁটি কুড়াইতে থাকিলে খাদেম তাহার নিকট গিয়া বলিল, খলীফা তোমাকে এই থলেটি দিয়াছেন। বৃদ্ধ মস্তক তুলিয়া শান্তভাবে বলিলেন, তুমি খলীফাকে গিয়া বলিও, এই থলে তিনি যেখান হইতে লইয়াছেন সেখানেই যেন রাখিয়া দেন। ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। অবশেষে খাদেম ব্যর্থ হইয়া যখন তথা হইতে ফেরত রওয়ানা হইল, তখন বৃদ্ধ নিম্নোক্ত বয়াতগুলি পাঠ করিতেছিলেন—

ارى الدنيا لمن هي في يديه — همومًا كلما كثرت لديه

تهين المكرمين لها بصغر = و تكرم كل من هانت عليه

اذا استغنيت عن شيء فدعه = و خذ ما انت محتاج اليه

অর্থঃ আমি দেখিতে পাইতেছি, যেই ব্যক্তির নিকট দুনিয়া (পার্থিব সম্পদ) বিদ্যমান, তাহার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তারও কোন অন্ত নাই। যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে ইজ্জত করে, দুনিয়া তাহাকে (অবশ্যই) অপমান করিয়া ছাড়ে। পক্ষান্তরে দুনিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্মান করে, যেই ব্যক্তি দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তুমি যদি কোন বস্তু হইতে অমুখাপেক্ষী ও বেপরওয়া হও, তবে উহার প্রতারণায় পতিত হইও না। আর তুমি কেবল এমন বস্তুই হাসিল করিও যাহা তোমার জন্য আবশ্যক।

হযরত সুফিয়ান ছাওরীর ঘটনা

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, ১৩৬ হিজরীতে খলীফা মাহদী যখন হজ্ব করিতে আসেন, তখনকার সেই দৃশ্য আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। খলীফা যখন তাওয়াফ করিতে শুরু করিলেন, তখন তাহার খাদেমগণ আশেপাশের লোকজনকে চাবুক দ্বারা প্রহার করিয়া তাড়াইতেছিল। এই সময় আমি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে সুদর্শন যুবক! আমার নিকট আয়মন বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ওয়ায়েল হইতে, ওয়ায়েল কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ আল কেলাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, কোরবানীর দিন তিনি উটের উপর সওয়ার হইয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছেন। এই সময় লোকেরা না কাহাকেও চাবুক দ্বারা প্রহার করিতেছিল, আর না লোকজনকে তাড়াইয়া তাঁহার জন্য পথ করিয়া দিতেছিল। অথচ তোমার লোকেরা ডানে-বামে লোকদেরকে প্রহার করিতেছে, আর তুমি তাওয়াফ করিতেছ।

খলীফা মাহদী এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে, যে আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলিতেছে? লোকেরা জানাইল, ইনি হযরত সুফিয়ান ছাওরী। এইবার খলীফা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আজ যদি আমার স্থলে খলীফা মনসুর হইতেন তবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার ঠোঁট নাড়িবারও সাহস হইত না। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, আমি যদি তোমাকে এই কথা বলিয়া দেই যে, খলীফা মনসুর তাহার কৃতকর্মের জন্য কি শাস্তি পাইয়াছে, তবে তুমিও তোমার এইসব অন্যায় কর্ম পরিত্যাগ করিতে। এই কথা বলিয়াই আমি এক দিকে সরিয়া গেলাম। এই সময় এক ব্যক্তি খলীফাকে বলিল, আপনি কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, লোকটি আপনাকে "আমীরুল মোমেনীন" এর

পরিবর্তে "সুদর্শন যুবক" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল? এই কথা শুনিয়া খলীফা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাকড়াও করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি এক জায়গায় আত্মগোপন করিয়া রহিলাম এবং লোকেরা আমার সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেল।

খলীফা মামুনের ঘটনা

একদা খলীফা মামুন এই কথা জানিতে পারিলেন যে, এক ব্যক্তি মুহতাসিবের ভূমিকায় মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়া ফিরিতেছে। অথচ সেই ব্যক্তিকে তিনি এই কাজের অনুমতি প্রদান করেন নাই। পরে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। যথা সময় তাহাকে দরবারে হাজির করা হইল। খলীফা মামুন তখন কুরসীতে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত একটি কিতাব পাঠ করিতেছিলেন। তাহার উভয় পা কুরসীর সম্মুখ ভাগে ঝুলিতেছিল। এই সময় কেমন করিয়া কিতাবের অভ্যন্তর হইতে একটি পাতা খসিয়া খলীফার পায়ের নীচে গিয়া পতিত হয়। কিন্তু খলীফা ইহার কিছুই টের পাইলেন না। আগত লোকটি এই দৃশ্য দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! প্রথমে আপনার পা আল্লাহর নামের উপর হইতে সরাইয়া ফেলুন, অতঃপর আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার করুন। কিন্তু খলীফা লোকটির কথার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না যে, আল্লাহর নামের উপর হইতে পা সরাইয়া লওয়ার অর্থ কি? তিনি লোকটিকে বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাহিতেছ স্পষ্ট করিয়া বল। লোকটি বলিলেন, আপনি যদি তাহা করিতে না পারেন তবে আমাকে অনুমতি দিন। খলীফা অনুমতি দিলে তিনি সামনে আগাইয়া আসিয়া খলীফার পদতল হইতে সেই কাগজটি উদ্ধার করিয়া তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। উহাতে আল্লাহর নাম লিখিত ছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া খলীফা যারপর নাই মর্মাহত ও লজ্জিত হইলেন। অতঃপর তিনি বেশ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং তাহার মুখ হইতে একটি কথাও সরিল না। পরে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া লোকটিকে বলিলেন, তুমি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার করিতেছ, অথচ এই কাজ তো আল্লাহ পাক কেবল আমাদের খান্দানের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তুমি কি সেই আয়াত পাঠ কর নাই, যেই আয়াতে আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ .

অর্থঃ "তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান

করিলে তাহারা নামাজ কায়েম করিবে, জাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিবে।" (সূরা হজ্বঃ আয়াত ৪১)

লোকটি বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও বিপুল সুযোগ দান করিয়াছেন। কিন্তু আপনি এই কথাও ভুলিবেন না যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকেও আপনাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী বানাইয়াছেন। এই বাস্তবতাকে সেই ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারে, যেই ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাহর মা'রেফাত হাসিল করিতে পারে নাই। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থঃ "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তাহারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ হইতে বিরত রাখে।" (সূরা তাওবাঃ আয়াত৭১)

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ

المؤمن من المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

অর্থঃ "এক মোমেন অপর মোমেনের জন্য এমারতের মত। যেমন এমারতের একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" (বোখারী, মুসলিম)

আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ পাক আপনাকে ভূ-পৃষ্ঠের কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। আর সৌভাগ্যক্রমে আপনি কোরআন হাদীসের এলেমও হাসিল করিয়াছেন। এখন আপনি যদি কোরআন ও হাদীসের আনুগত্যপূর্বক শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া চলেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি এমন লোকদের কৃতজ্ঞতা আদায় করিবেন যাহারা এই কর্মে আপনাকে সহযোগিতা করিবে। পক্ষান্তরে আপনি যদি কোরআন-সুন্নাহ হইতে বিমুখ হইয়া শরীয়তের নিষিদ্ধ পথে চলেন, তবে আপনি সুস্পষ্টভাবেই জানিয়া রাখুন আল্লাহর বান্দাগণ অবশ্যই তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন এবং আল্লাহ পাকের কৃত ওয়াদার উপর পরিপূর্ণ আস্থার সহিত তাহারা নিজেদের আমল অব্যাহত রাখিবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً

অর্থঃ "আমি সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।" (সূরা কাহাফ ঃ আয়াত ৩০)

এখন আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন। খলীফা মামুন এই যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়া লোকটিকে বলিলেন, আপনার মত এমন লোকদের পক্ষে "আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার" করিতে কোন

আপত্তি নাই। এখন হইতে আপনি আমার অনুমতি সাপেক্ষেই এই আমল করিতে থাকুন।

মোটকথা, এইসব ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নহে।

ছেলে পিতাকে আদেশ-নিষেধ করিতে পারিবে কি না

ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, পিতা তাহার ছেলেকে, স্বামী স্ত্রীকে, উস্তাদ তাহার ছাত্রকে, মনিব গোলামকে এবং বাদশাহ তাহার প্রজা সাধারণকে সর্বাবস্থায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে পারিবে। এখন প্রশ্ন হইল– অনুরূপভাবে ছেলে তাহার পিতাকে, স্ত্রী তাহার স্বামীকে, ছাত্র তাহার উস্তাদকে, গোলাম তাহার মনিবকে এবং প্রজা তাহার বাদশাহকে অন্যায় কর্মে বাধা প্রদান করিতে পারিবে কিনা? এই প্রশ্নের জবাব হইল, আমরা বর্ণিত শ্রেণীসমূহের উভয় পক্ষের জন্যই "অসৎ কাজের নিষেধ" স্বীকৃত বলিয়া সমর্থন করি। তবে উহার প্রয়োগ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

উদাহরণ স্বরূপ, পিতার উপর ছেলের "অসৎ কাজের নিষেধ" এর প্রসঙ্গই ধরুন– ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, আদেশ ও নিষেধের পাঁচটি স্তর রহিয়াছে। কিন্তু ছেলের পক্ষে কেবল প্রথম দুইটি স্তরেই জায়েজ। অর্থাৎ মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন (পিতা যদি কোন বিষয় অবগত না থাকেন, তবে সেই বিষয়টি তাহাকে জানাইয়া দেওয়া) এবং দরদ ও মোহাব্বতের সহিত তাহাকে নসীহত করা। আর সেই পাঁচটি স্তরের শেষ দুইটি ছেলের জন্য জায়েজ নহে। সেই দুইটি স্তর হইল, মানুষকে জোরপূর্বক কোন কাজে বাধা দেওয়া এবং ধমকানো বা মারধর করা। আর তৃতীয় স্তরটি একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন এই স্তরটির অবস্থা হইল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের এই স্তরটির উপর আমলকারী ব্যক্তি কোন অসৎ ও অনিষ্ট কর্ম দেখিলে তাহা মিটাইয়া দেয়। যেমন, খেল তামাশার দ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র দেখিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা, শরাবের পাত্র ফেলিয়া দেওয়া, ঘরে কোন ছিনতাইকৃত দ্রব্য বা চুরি করা মালামাল থাকিলে তাহা প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া, ঘরের দেয়ালে বা ছাদের কার্নিশে কোন প্রাণীর ছবি থাকিলে তাহা মুছিয়া ফেলা কিংবা সোনা-রূপার তৈজস থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা– ইত্যাদি।

এখন কেহ হয়ত বলিতে পারে যে, অসৎ কাজের নিষেধের এই স্তরটিতে ছেলের এইসব আচরণে পিতার মনে কষ্ট হইবে এবং সন্তানের উপর সে অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হইল, ধমকানো ও মারধর করিলে

যেমন পিতা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় না। বরং সংশ্লিষ্ট বস্তুটিই এখানে লক্ষে পরিণত হয়– যদিও ছেলের এইরূপ আচরণে পিতা অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু ছেলের এই কর্মটি হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই ক্ষেত্রে পিতার অসন্তুষ্টি নাহক ও বাতিলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই কারণেই তাহার অসন্তুষ্টিকে গ্রাহ্য করা হইবে না। কেয়াস ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধির দাবীও ইহাই যে, এই ক্ষেত্রে ছেলের আচরণ কেবল হক ও বৈধই নহে; বরং উহাকে আবশ্যক ঘোষণা দিয়া বলা হইবে যে, সে যেন এইরূপই করে এবং এই ক্ষেত্রে পিতার অসন্তুষ্টিতে বিব্রত বোধ না করে।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এতটুকু বিবেচনা করিতে হইবে যে, ছেলে যেই অসৎ কর্মটি দূর করিতে চাহিতেছে, উহার অনিষ্টের পরিমাণ কতটুকু এবং পিতা এই ক্ষেত্রে যেই কষ্ট পাইবেন উহার পরিমাণ কতটুকু। যদি এইরূপ হয় যে, খারাপ কর্মটি খুবই নিকৃষ্ট এবং উহা মিটাইয়া দিলে পিতা কষ্ট পাওয়ার পরিমাণ খুব বেশী নহে; যেমন– এমন ব্যক্তির শরাব ফেলিয়া দেওয়া যেই ব্যক্তি এই কারণে খুব বেশী অসন্তুষ্ট হইবে না, তবে তো নির্দ্বিধায় এই খারাপ কর্মটি মিটাইয়া দেওয়া উচিৎ। পক্ষান্তরে খারাপ কর্মটির অনিষ্ট যদি তুলনামূলক খুব বেশী মারাত্মক না হয় এবং উহা মিটাইয়া দেওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্রোধের মাত্রা খুব বেশী হওয়ার আশংকা হয়, যেমন– কোন মূল্যবান কাঁচপাত্রে হয়ত কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কিত আছে, তো এই ছবির অনিষ্ট নিশ্চয়ই শরাবের অনিষ্টের তুলনায় কম, তা ছাড়া শরাবের তুলনায় কাঁচ পাত্রের মূল্য অনেক বেশী। সুতরাং ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিষয়টাকে বিবেচনায় আনিতে হইবে।

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোরআন-হাদীসে তো অন্যায়ের প্রতিরোধের বিধানটি সকলের জন্য সমানভাবে বিবৃত হইয়াছে। নির্দিষ্টভাবে কাহারো জন্যই ইহা শিথিল করা হয় নাই। আর মাতাপিতাকে কষ্ট না দেওয়ার বিধানটি নির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহারা কোন পাপকর্মে লিপ্ত হয়। অথচ আপনি কি কারণে পিতার প্রতি ছেলের আদেশ-নিষেধের পাঁচটি স্তরের কেবল তিনটিকে অনুমোদন করিয়া অপর দুইটি হইতে তাহাদিগকে পৃথক রাখিতেছেন? অর্থাৎ আপনার মতে পিতা কোন অপরাধে লিপ্ত হইলেও ছেলে তাহাকে ডাঁট-ধমক ও শাসন করিয়া উহা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া রাখার চেষ্টা করিতে পারিবে না। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, শরীয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাকে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে রাখিয়াছে। যেমন কোন জল্লাদের পক্ষে ব্যভিচারের অপরাধে অভিযুক্ত তাহার পিতাকে হত্যা করা বা পিতার অন্য কোন শাস্তি প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

অনুরূপভাবে কোন মুসলমান ছেলের পক্ষে তাহার কাফের পিতাকে হত্যা করা জায়েজ নহে। শরীয়তে পিতার হক এই পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন পিতা যদি তাহার ছেলের হস্ত কর্তন করিয়া ফেলে, তবে এই অপরাধের কারণে পিতার উপর কেসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের আইন) কার্যকর হইবে না। এমনকি হস্ত কর্তনে প্রতিশোধ হিসাবে ছেলে পিতাকে কোনরূপ কষ্টও দিতে পারিবে না। এই বিষয়ে বহু ঘটনা উল্লেখ আছে এবং এই বিষয়ে কাহারো কোনরূপ মতভেদ নাই। তো মনিব, স্বামী ও বাদশাহর ক্ষেত্রেও এই ব্যতিক্রম প্রযোজ্য হইবে। রাজা-প্রজার সম্পর্কটি পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও মনিব-গোলামের সম্পর্কের চাইতেও অধিক নাজুক। বাদশাহকে কেবল প্রথমোক্ত দুইটি স্তরেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে। তৃতীয় স্তরটিকে বিবেচনায় আনিতে হইবে। কেননা, এই ক্ষেত্রে বাদশাহর খাজানা হইতে মাল বাহির করিয়া প্রকৃত মালিককে ফেরৎ দেওয়া, তাহার ঘর হইতে খেল-তামাশার আসবাব, বাদ্যযন্ত্র ও শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা– ইত্যাদি কর্মগুলি দৃশ্যমান হইবে। আর এই সবের ফলে বাদশাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে। অথচ বাদশাহর ইজ্জত ও সম্মানের পরিপন্থী কোন কাজ করা এমনই নিষিদ্ধ, যেমন কোন পাপ কর্ম দেখিয়া নীরব থাকা নিষিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হইল, এই দুইটি নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন্‌টির উপর আমল করা হইবে? এই প্রশ্নের জবাব হইল, অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্তই এখানে কার্যকর মনে করা হইবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইজতিহাদ ও বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে, পাপকার্যটি অধিক বিপদজনক, না উহা দূর করা অধিক বিপদজনক। সঠিক ইজতিহাদ ও গভীর বিবেচনার পর যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে উহার উপরই আমল করিবে।

উস্তাদ ও শাগরিদের বিষয়টি খুবই সহজ। কেননা, প্রকৃত পক্ষে এমন উস্তাদই সম্মানের পাত্র যিনি দ্বীনের এলেম ও বিধানের অনুগামী হইবেন। পক্ষান্তরে এমন আলেমের জন্য কোন সম্মান নাই; যিনি নিজের এলেম অনুযায়ী আমল করেন না। সুতরাং একজন শাগরিদের কর্তব্য হইল, উস্তাদের সঙ্গে সেই এলেম অনুযায়ী আচরণ করা যেই এলেম সে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নিজের পিতার সঙ্গে কেমন করিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধ করা হইবে? জবাবে তিনি বলিলেন, পিতাকে আদবের সহিত নসীহত করিতে হইবে। তিনি যদি সেই নসীহতে কর্ণপাত না করেন, তবে নীরব থাকিবে এবং এই বিষয়ে তাহার সঙ্গে কোন তর্ক করিবে না।

পঞ্চম শর্তঃ আদেশ ও নিষেধকারী ক্ষমতাবান হওয়া

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করার পঞ্চম শর্ত হইতেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কাজে সক্ষম ও ক্ষমতাবান হওয়া। সুতরাং অক্ষম ব্যক্তি কেবল অন্তরের মাধ্যমেই এই বিষয়ের উপর আমল করিবে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে হাত ও মুখ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করা হইবে। যেই ব্যক্তি আল্লাহকে মোহাব্বত করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই পাপাচারকে ঘৃণা করিবে এবং অন্তর দ্বারা উহাকে খারাপ মনে করিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কাফেরের বিরুদ্ধে নিজের হাত দ্বারা জেহাদ কর। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে তাহাদের সম্মুখে কেবল এমনভাবে নাক সিঁটকাইবে যেন উহা দ্বারা তোমার অন্তরের ঘৃণা প্রকাশ পায়। বিষয়টাকে ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন। অক্ষমতা প্রকাশের জন্য কার্যত অনিষ্টের শিকার হওয়া ও কষ্ট পাওয়া জরুরী নহে; বরং যেই ক্ষেত্রে অনিষ্টের শিকার হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিবে, সেই ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অক্ষম মনে করা হইবে। এমন ব্যক্তিকেও অক্ষম মনে করা হইবে যেই ব্যক্তি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, প্রতিপক্ষ তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং লোকটিকে পাপাচার হইতে ফিরাইয়া রাখার ব্যাপারে তাহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হইবে না।

উপরোক্ত দুইটি অবস্থার আলোকে "সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" এর চারিটি অবস্থা দাঁড়াইল–

(এক) প্রথমতঃ বর্ণিত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান হওয়া। অর্থাৎ এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে, যাহাকে উপদেশ দিব সে আমার কথা মানিবে না এবং এইরূপ আশংকা হওয়া যে, আমি যদি তাহার মর্জির খেলাফ কিছু বলি, তবে সে আমার উপর চড়াও হইতেও পিছপা হইবে না। এমতাবস্থায় আদেশ ও নিষেধের উপর আমল করা ওয়াজিব নহে। বরং কতক ক্ষেত্রে ইহা হারাম। অবশ্য এইরূপ পরিস্থিতিতে অন্যায় প্রতিরোধকারীর কর্তব্য হইল, এমন স্থানে গমন করা হইতে বিরত থাকা যেখানে অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে গৃহে অবস্থান করিবে এবং একান্ত আবশ্যক না হইলে ঘর হইতে বাহির হইবে না। অবশ্য এমন পরিস্থিতিতে নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া অন্য কোন নিরাপদ স্থানে হিজরত করা ওয়াজিব হইবে না। কেননা দেশ-ত্যাগ কেবল তখনই আবশ্যক হইতে পারে, যখন লোকেরা তাহাকে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া এবং সরকারী জুলুম ও নির্যাতনকে সমর্থন দানে বাধ্য করে। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও হিজরতের জন্য শর্ত হইল, তাহার পক্ষে হিজরতের সামর্থ্য থাকিতে হইবে। যেই ব্যক্তি এইসব অনিষ্ট ও জবরদস্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহার

পক্ষে এই "অনিষ্ট ও জবরদস্তি" ওজরের মধ্যে গণ্য হইবে না।

(দুই) দ্বিতীয় অবস্থা হইল, বর্ণিত দুইটি অবস্থাই বিদ্যমান না হওয়া। অর্থাৎ কথা ও কর্ম দ্বারা সেই ব্যক্তিকে অপরাধ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিলে তাহা ফলপ্রসু হইবে এবং সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে কোনরূপ অনিষ্টেরও আশংকা নাই। এই অবস্থায় আদেশ-নিষেধকারীকে যথার্থ ক্ষমতাবান মনে করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব হইবে।

(তিন) তৃতীয় অবস্থা হইল, উপরোক্ত দুইটি অবস্থার একটি বিদ্যমান এবং অপরটি বিদ্যমান না হওয়া। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে তাহা ফলপ্রসু হইবে না বটে, তবে উহার কারণে সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে কোনরূপ অনিষ্টেরও আশংকা নাই। এই অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ওয়াজিব নহে, বরং মোস্তাহাব।

(চার) চতুর্থ অবস্থা হইল তৃতীয় অবস্থার বিপরীত। অর্থাৎ "নেহী আনিল মুনকার" তথা অন্যায়ের প্রতিরোধ করিলে তাহাতে ফল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু কষ্ট পাইতে হইবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি পাথর নিক্ষেপ করিয়া শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে এবং বাদ্যযন্ত্র ও গান বাজনার সরঞ্জাম নষ্ট করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি ইহাও জানে যে, পাপী লোকটি আমার এই আচরণ নীরবে মানিয়া লইবে না। বরং সে হয়ত আমার নিক্ষিপ্ত পাথরটি দ্বারাই আমার মাথা ফাটাইয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ওয়াজিবও নহে এবং হারামও নহে। বরং মোস্তাহাব। ইতিপূর্বে আমরা জালেম শাসকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ সংক্রান্ত যেই বিবরণ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই শেষোক্ত অবস্থারই উদাহরণ।

অবশ্য এই বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নাই যে, এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" অত্যন্ত বিপদজনক। অর্থাৎ– এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে যাওয়ার অর্থ হইতেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের জীবনকে বাজী রাখিয়া সামনে অগ্রসর হইতেছে এবং এই বাজীতে সে যে কোন সময় হারিয়া গিয়া তাহার জীবনের বিপর্যয় ঘটিতে পারে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, একবার আমি এক খলীফার মুখে এমন কিছু কথা শুনিলাম যাহা ছিল স্পষ্ট গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। আর এই ক্ষেত্রে উহার প্রতিবাদ করাও জরুরী ছিল। এমতাবস্থায় আমি এইরূপ মনস্থ করিলাম যে, আমি খলীফার বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া এই প্রসঙ্গে যাহা সত্য ও যথার্থ তাহা প্রকাশ করিব। আর এই কথাও আমার জানা ছিল যে, খলীফা আমার এই প্রতিবাদকে অপরাধের মধ্যে গণ্য করিয়া উহার শাস্তি হিসাবে আমাকে হত্যা করিবেন। কিন্তু এই ঘটনাটি যেহেতু এমন এক

মজলিসে ঘটিয়াছিল যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন, ফলে আমার মনে এমন আশংকা হইল যে, আমি হয়ত মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্যকে বেশ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া পেশ করিব এবং উহার ফলে আমার এই শাহাদাতের পিছনে এখলাসের পরিবর্তে সুখ্যাতি অর্জনই উদ্দেশ্য হইয়া পড়িবে।

একটি আয়াতের মর্ম

উপরে যেই বিষয়টি আলোচনা করা হইল সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আপনি তো বলিতেছেন, প্রাণ হারাইবার আশংকা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মোস্তাহাব। অথচ আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন–

وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থঃ "এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিও না।"

(সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৯৫)

এই আয়াত দ্বারা জানা যায়, জানিয়া শুনিয়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া জায়েজ নহে। এই প্রশ্নের জবাব দানের পূর্বে আমি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিব, একজন মুসলমানের পক্ষে একা কাফেরদের ভীড়ের মাঝে ঢুকিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করা কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে– যেই ক্ষেত্রে তাহার ইহাও জানা আছে যে, এই আক্রমণের পর তথা হইতে কোনক্রমেই সে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না? যদি বলা হয়, এইরূপ অবস্থায়ও ইহা সঙ্গত বটে। তবে আমি প্রশ্ন করিব, এইরূপ করিলে কি তাহা বর্ণিত আয়াতের পরিপন্থী কাজ হইবে না?

আয়াতে বর্ণিত 'তাহলুকা' তথা "ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া" এর অর্থ যদি ইহাই মানিয়া লওয়া হয় যাহা প্রশ্নকর্তা উপলব্ধি করিয়াছে, তবে তো এই আয়াত সেই ব্যক্তির জন্যও প্রতিবন্ধক হইবে, যেই ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর কথা জানা থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ রচনা করে। কিন্তু আমরা প্রশ্নকর্তার ধারণার সহিত একমত পোষণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের সম্মুখে তো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি বিদ্যমান। তিনি বলিয়াছেন, 'তাহলুকা' অর্থ একাকী শত্রুদের কাতারে ঢুকিয়া পড়িয়া আক্রমণ করা নহে। বরং উহার অর্থ হইতেছে– আল্লাহর আনুগত্য করিতে গিয়া খানাপিনা ত্যাগ করা। অর্থাৎ আহারাদি ত্যাগ করিয়া নিজের জানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। এদিকে হযরত বারা ইবনে আজিব (রাঃ) বলেন, 'তাহলুকা' বা নিজেকে নিজে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে– গোনাহ ও

পাপাচারে লিপ্ত থাকা আর এইরূপ মনে করা যে, আমার তওবা যেহেতু কবুল হইবে না, সুতরাং আমি তওবা করিব না। হযরত ওবায়দা (রাঃ) বলেন, 'তাহলুকা' হইতেছে– গোনাহ্ করা এবং উহার পর কোন নেক আমল না করা এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া।

মোটকথা, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইবার নিশ্চিত আশংকার পরও শত্রুর উপর আক্রমণ করা এবং তাহাদের ব্যুহ ভেদ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করা যেহেতু জায়েজ, সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধ করাও জায়েজ হওয়া উচিত– যদিও সেই ক্ষেত্রে প্রাণ হারাইবার আশংকা থাকে। অবশ্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যদি এইরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস হয় যে, আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষের কিছুমাত্র ক্ষতি করা যাইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে আক্রমণ করা জায়েজ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন অন্ধ ও প্রতিবন্ধির পক্ষে একা শত্রু বাহিনীর উপর হামলা করা। প্রকাশ থাকে যে, একজন অন্ধ বা মাজুর ব্যক্তি রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ করিয়া কেবল নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিবে না। এমন ব্যক্তির পক্ষে শত্রুর উপর আক্রমণ করা জায়েজ নহে।

অবশ্য শত্রু বাহিনীর উপর একাকী আক্রমণ করা এমন ক্ষেত্রে জায়েজ হইবে, যখন আক্রমণকারীর এমন নিশ্চিত বিশ্বাস থাকিবে যে, এই আক্রমণে আমি বিপুল সংখ্যক শত্রুকে হত্যা করিয়া তবে নিহত হইব। কিংবা আক্রমণকারী যদি এই বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, আমি যদিও কাহাকেও হত্যা করিতে পারিব না, কিন্তু রণাঙ্গনে আমি এমন ক্ষিপ্রতার সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িব যে, উহার ফলে শত্রুপক্ষ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং আমার এই বীরত্ব দেখিয়া তাহারা অপরাপর মুসলমানদের সম্পর্কেও এইরূপ ধারণা পোষণ করিবে যে, নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যেও এইরূপ জযবা ও বীরত্ব বিদ্যমান এবং তাহারাও আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণের ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন শক্তির কিছুমাত্র পরওয়া করিবে না।

অনুরূপভাবে ইহ্তিসাব তথা অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও যদি এইরূপ লক্ষ্য স্থির করা হয় এবং অনুরূপ ফলপ্রাপ্তির আশাও করা যায় তবে উহাকেও বর্ণিত জেহাদের মত কেয়াস করিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে। অর্থাৎ জেহাদের ক্ষেত্রে বর্ণিত অবস্থায় যেমন প্রাণ হারাইবার নিশ্চিত আশংকার পরও আক্রমণ করা জায়েজ, তদ্রূপ অন্যায়ের প্রতিরোধ করাও জায়েজ হইবে। বরং প্রতিরোধের ফলে পাপী লোকেরা পাপাচার হইতে বিরত হইবে বা তাহাদের অন্যায় প্রভাব প্রশমন হইবে কিংবা তাহার এই তৎপরতা দেখিয়া মুসলমানদের অন্তরে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিবে; তবে তাহার পক্ষে যাবতীয় প্রতিকূলতা ও জীবনাশংকার পরওয়া না করিয়া অন্যায়ের প্রতিরোধ করা মোস্তাহাব হইবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে অপর যেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে তাহা হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রতিপক্ষ হইতে সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা যেন কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ যদি এইরূপ আশংকা হয় যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া কেবল আমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব না; বরং আমার সঙ্গে আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের লোকজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা জায়েজ নহে। কেননা, উহার ফলে যেন একটি অন্যায় দমন করা হইবে অপর একটি অন্যায়ের মাধ্যমে। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্যায়ের প্রতিরোধে ক্ষমতাবান মনে করা হইবে না। কেননা, অন্যায়ের প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হইতেছে, সার্বিকভাবেই অন্যায়ের দমন। অর্থাৎ এমন নহে যে, একটি অন্যায় দমন করিয়া অপর একটি অন্যায়ের জন্ম দেওয়া।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপ- এক ব্যক্তির নিকট হালাল শরবত ছিল। ঘটনাক্রমে উহাতে কোন ময়লা পতিত হওয়ার কারণে উহা নাপাক হইয়া যায়। এখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি এই শরবত ফেলিয়া দেই, তবে সেই ব্যক্তি শরাব পান করিতে শুরু করিবে। অর্থাৎ উহার অর্থ যেন একটি অন্যায় দমন করিতে গিয়া অপর একটি অনিষ্টের জন্ম দেওয়া হইবে। সুতরাং এমতাবস্থায় নাপাক ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অবশ্য এক শ্রেণীর লোকের মতামত হইল, এই ক্ষেত্রে নাপাক ফেলিয়া দেওয়াই উত্তম। অতঃপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি শরবতের অভাবে শরাব পান করিতে শুরু করে, তবে উহার দায়-দায়িত্ব তাহার নিজের। অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি এই জন্য দায়ী নহে। সে তাহার দায়িত্ব পালন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের ধারণায় এই মতামতও ঠিক নহে। আমরা মনে করি, এই মাসআলাটিও সেইসব মাসায়েলের অন্তর্ভুক্ত, যেই ক্ষেত্রে সঠিক ইজতেহাদের উপর ফায়সালা করা হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি নিজে খাওয়ার জন্য অপর কাহারো একটি বকরী জবাই করিতেছে। এখন অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি তাহাকে এই কাজে বাঁধা দেই, তবে সে এই বকরীর পরিবর্তে অপর কোন মানুষকেই জবাই করিয়া খাইতে শুরু করিবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাহাকে বকরী জবাই করিতে বাধা না দেওয়াই কর্তব্য। কিংবা মনে করুন, এক ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিতেছে। এখন অসৎ কাজের বাধা প্রদানকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, আমি যদি তাহাকে এই অন্যায় হত্যাকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করি, তবে হত্যার পরিবর্তে সে ঐ ব্যক্তির মালামাল ছিনাইয়া লইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে নিবৃত্ত করাই বিধেয়। অর্থাৎ এই জাতীয় সূক্ষ্ম অবস্থায় সঠিক ইজতিহাদের উপর আমল করিতে হইবে।

সুতরাং বর্ণিত সূক্ষ্ম অবস্থাসমূহের কারণেই আমরা বলি, এই জাতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার না করাই

ভাল। তাহারা বরং এমন সব বিষয়ে আমর ও নেহী করিবে যাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট ও বোধগম্য এবং কোনরূপ সূক্ষ্মতার আবরণে আবৃত নহে। যেমন শরাব পান, ব্যভিচার ও নামাজ তরক ইত্যাদি কর্মে বাধা প্রদান করা। কেননা, কোন কোন কর্ম এইরূপ আছে, বাহ্য দৃষ্টিতে যেইগুলিকে পাপাচার ও গোনাহের কাজ বলিয়াই মনে হইবে। অথচ প্রকৃত পক্ষে সেইগুলিতে কোনরূপ গোনাহের মিশ্রণ থাকে না। তো সাধারণ মানুষ যদি এইরূপ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, তবে হিতে বিপরীত ও কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই কারণেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের জন্য শাসনকর্তার অনুমতির শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। কেননা, এই শর্ত আরোপ করা না হইলে হয়ত দেখা যাইবে, এমনসব লোকেরাও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ শুরু করিয়া দিয়াছে, যাহারা নিজেদের এলেমের দৈন্য ও দক্ষতার অভাবে এই কাজের যথাযোগ্য পাত্র নহে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে- ইনশাআল্লাহ।

সুস্পষ্ট অবগতি বনাম ধারণা

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ইতিপূর্বে আপনি আলোচনা করিয়াছেন, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যদি প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এলেম থাকে, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে না। এখানে এই এলেম ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধকারী যদি ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে এলেমের পরিবর্তে কেবল 'ধারণা' পোষণ করে, তবে এই ক্ষেত্রে কি হুকুম? এই প্রশ্নের জবাব হইল এইরূপ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাকে এলেমের পর্যায়ে মনে করা হইবে। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এলেম ও ধারণা একটি অপরটির বিপরীত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে নিশ্চিত এলেমকে ধারণার উপর প্রাধান্য দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর ক্ষেত্রে এলেম ও ধারণার হুকুম পৃথক পৃথক।

উদাহরণতঃ কোন ক্ষেত্রে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধকারী এই কথা জানিতে পারে যে, এখানে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়া কোন কাজ হইবে না, তবে এই ক্ষেত্রে তাহার উপর হইতে এই দায়িত্ব রহিত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে অন্যায়ের প্রতিরোধে কাজ না হওয়ার বিষয়ে যদি তাহার প্রবল ধারণা হয়, আবার কাজ হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনাও বিদ্যমান থাকে এবং একই সঙ্গে যদি ইহাও সে জানিতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিরও আশংকা নাই; তবে এমতাবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। তবে অধিকাংশের মতে এই ক্ষেত্রেও অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব হওয়া চাই। কেননা, এই ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন আশংকা নাই এবং

উপকার হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার সংক্রান্ত কোরানিক দলীলসমূহ দ্বারা ইহা আমভাবে ওয়াজিব হওয়াই প্রমাণিত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষ ইহার 'ব্যতিক্রম' এজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়। কেয়াস হইল এই যে, এই আদেশ ও নিষেধ সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নহে; বরং যেই ব্যক্তির উপর এই আদেশ ও নিষেধ প্রয়োগ করা হইবে, সেই ব্যক্তিই উহার মূল লক্ষ্য। সুতরাং এই বিষয়টি যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোনভাবেই এই আদেশ ও নিষেধ কবুল করিবে না, তবে এই ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও ওয়াজিব হইবে না। পক্ষান্তরে উহা কার্যকর হওয়ার ক্ষীনতম সম্ভাবনাও যদি থাকে, তবে এই ওয়াজিব রহিত হইবে না।

মোটকথা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে যদি প্রতিপক্ষ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তবে উহার উপর আমল করা ওয়াজিব হইবে না। আর ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার বিষয়ে যদি প্রবল ধারণা থাকে, তবে উহার উপর আমল করা ওয়াজিব হইবে। অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দুর্বল সম্ভাবনার কারণে এই ওয়াজিব রহিত হয় না। কেননা, এই ধরনের সম্ভাবনা তো যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই হইতে পারে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে বিষয়টাকে বিবেচনায় আনা যাইতে পারে।

সাহস ও ভীতির মাপকাঠি

প্রকাশ থাকে যে, কোন কাজে অনিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাহস ও দুর্বল চিত্ততার কারণে বিভিন্ন রকম হইতে পারে। দুর্বলচিত্ত ও ভীতু মানুষ তো দূরের ক্ষতিকেও নিকটে মনে করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বীর পুরুষ ও সাহসী ব্যক্তি কোন অনিষ্টকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমলেই আনে না, যতক্ষণ না তাহা অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেক সময় তো সাহসী লোকেরা অনিষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও সাহস হারায় না। এখন এই প্রসঙ্গে কোন্ ব্যক্তিকে মানদণ্ড নির্ধারণ করা হইবে? এমন ভীতু ব্যক্তি, যে বিপদের সম্ভাবনাতেই ভীত হইয়া পড়ে, না এমন সাহসী ব্যক্তিকে, যে বিপদ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরও সাহস হারায় না তাহাকে? এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলিব, সুস্থ বিবেক-বিবেচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিই এই ক্ষেত্রে মানদণ্ড। ভীতু ব্যক্তির দুর্বল মনোবল এমন একটি ব্যাধি, যাহা মানুষকে শক্তিহীন করিয়া দেয়। এদিকে অসঙ্গত সাহসও বর্ণিত ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলের পরিপন্থী এবং উহার ফলেও মানুষ বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। এই দুইটি অবস্থাই বর্জনীয় এবং এই ক্ষেত্রে

কেবল ভারসাম্যপূর্ণ মনোবলই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাটিই হইল যথার্থ বীরত্ব। অবশ্য অনেক সময় এই যথার্থ বীর পুরুষগণও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ত্রুটির শিকার হয় এবং অনিষ্টকর অবস্থা চিহ্নিত করিতে ব্যর্থ হইয়া অসঙ্গত সাহস করিয়া বসে। এইরূপ অসঙ্গত দুঃসাহসের কারণ হইল জেহালাত ও মূর্খতা। আবার অনেক সময় অনিষ্ট দমনের মওকা না বুঝিবার কারণেও এইরূপ লোকেরা সাহস হারাইয়া ফেলে। উহা কারণও সেই মূর্খতাই। আরেকটি অবস্থা হইল- অনেক সময় মানুষ অনিষ্টের মওকা এবং উহার দমনের উপায় ও তদ্বির সম্পর্কে অবগত থাকে বটে এবং এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও থাকে; কিন্তু অন্তরের দুর্বলতার কারণে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে না। দূর ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহার মনের উপর এমন প্রভাব ফেলে, যেমন একজন সাহসী ব্যক্তির অন্তরে নিকট ভবিষ্যতের আশংকায় হইয়া থাকে। এই কারণেই আমরা বলিয়াছি, অসঙ্গত সাহস কিংবা মাত্রাতিরিক্ত দুর্বলতা এই দুইটির কোনটিই কাম্য নহে; বরং এই ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য অবস্থা হইল সুস্থ বিবেক-বিবেচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোবল। সুতরাং ভীতু ব্যক্তির কর্তব্য হইল, তাহার মনের ভয় প্রশমনের চিকিৎসা করা এবং যেই কারণে মনে ভয় পয়দা হইতেছে তাহা দূর করা। সেই কারণটিই হইল মূর্খতা কিংবা মনের দুর্বলতা। মূর্খতা দূর হয় অভিজ্ঞতা দ্বারা আর মনের দুর্বলতা দূর হয় সেই কর্মটি পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান দ্বারা যাহা অন্তরে ভীতি সৃষ্টির মূল কারণ। অর্থাৎ কোন কাজ বার বার করিলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং এই অভ্যাসের ফলে অন্তরে শক্তি পয়দা হয়। এই কারণেই দেখা যায়- প্রাথমিক ছাত্রগণ মোনাজারা-বিতর্ক ও বক্তৃতার নাম শুনিলেই ভয় পায় এবং লোকসমাগমে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু ক্রমাগত কিছু দিন অভ্যাস করিবার পর যখন এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা পয়দা হয়, তখন মনের দুর্বলতা ও মুখের জড়তা ইত্যাদি দূর হইয়া লক্ষ মানুষের সম্মুখে অনর্গল বক্তৃতা করিতেও কোন সমস্যা হয় না।

এখন কোন ব্যক্তির মনোবল যদি এমনই দুর্বল হয় যে, কোন ভাবেই তাহা দূর করা সম্ভব হইতেছে না, তখন তাহার অবস্থার প্রেক্ষিতেই তাহার উপর মাসআলা প্রয়োগ হইবে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে শরীয়তের অনেক আবশ্যকীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে মাজুর (অপারগ) মনে করা হয়। তদ্রূপ, মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিকে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার পালনের ক্ষেত্রে মাজুর মনে করা হইবে। এই কারণেই আমরা বলি, কোন দুর্বলমনা ব্যক্তি যদি কোনভাবেই সমুদ্রে সফর করিতে সাহস না করে, তবে তাহার পক্ষে (সমুদ্র সফরের মাধ্যমে) হজ্জ করা ফরজ হইবে না।

অনিষ্ট ও ক্ষতির মাত্রা

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, উপরের আলোচনায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে যেই অনিষ্ট ও ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার মাত্রা বা পরিমাণ কি? সকল মানুষের অবস্থা তো এক রকম নহে। কেহ হয়ত সামান্য কটু কথা দ্বারাই বেশ আঘাত পায়। কেহ আঘাত পায় প্রহার করিলে। আবার এমন মানুষও আছে, যাহারা কোনক্রমেই ইহা সহ্য করিতে পারে না যে, মানুষ তাহার নামে গীবত-শেকায়েত বা সমালোচনা করুক। অর্থাৎ মানুষের পক্ষ হইতে অনিষ্ট ও ক্ষতির শিকার বা কষ্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলের অনুভূতি এক রকম নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হইতে অনিষ্ট, ক্ষতি বা কষ্ট পাওয়ার এমন একটি মানদণ্ড থাকা উচিৎ যাহা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে এবং উহা বিদ্যমান অবস্থায় যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার বৈধতা নির্ধারণ করা যায়।

বস্তুতঃ উপরোক্ত প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল। কেননা, অনিষ্ট ও ক্ষতির ধরণ-প্রকরণ যেমন ব্যাপক, তদ্রূপ উহার প্রয়োগস্থলও অনেক। কিন্তু তবুও এই বিষয়ে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করিব যেন এই বিষয়ে কোনরূপ অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, অনিষ্ট হইল মানুষের চাহিদার পরিপন্থী বিষয়। দুনিয়াতে মানুষের চাহিদা মোট চারি প্রকার। যেমন, এলেম– স্বাস্থ্য, সম্পদ ও প্রভাব। আত্মার চাহিদা হইল এলেম ও বিদ্যা। দেহের চাহিদা স্বাস্থ্য। সম্পদের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এবং মানুষের অন্তরে ইজ্জত ও প্রভাব বিস্তারও মানুষের চাহিদা। প্রভাবের অর্থ হইতেছে মানুষের অন্তরের মালিক হওয়া। অর্থাৎ মানুষ যেমন সম্পদের মালিক হইয়া উহা নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করে, তদ্রূপ প্রভাবের মাধ্যমেও মানুষের অন্তরের কর্তৃত্ব হাসিল করিয়া উহা দ্বারা মানুষ নিজের কার্যোদ্ধার করিতে পারে।

উপরে বর্ণিত চারিটি বিষয় মানুষ কেবল নিজের জন্যই কামনা করে না, বরং মানুষ উহা নিজের ঘনিষ্ঠজনদের জন্যও প্রত্যাশা করে। মানুষের চাহিদার এই চারিটি বিষয়ের পাশাপাশি আরো দুইটি বিষয় তাহার নিকট খুবই অনাকাংখিত।

প্রথমতঃ যাহা হাসিল হইয়াছে তাহা বিনষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ যাহা এখনো হাসিল হয় নাই বরং হাসিল হওয়ার আশা আছে, সেই প্রত্যাশিত বস্তুটি হাসিল না হওয়া। প্রত্যাশিত বলা হয় এমন বস্তুকে যাহা হাসিল হওয়া সম্ভব। তো যেই বস্তুটি প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান, উহা যেন প্রাপ্ত

বস্তুর মধ্যেই গণ্য। সুতরাং এহেন সম্ভাবনা নাকোচ হওয়াও যেন প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হওয়ার মধ্যে গণ্য। এক্ষণে এই পর্যালোচনার অর্থ দাঁড়াইতেছে, অনিষ্ট ও ক্ষতি কেবল দুই প্রকার–

প্রথম প্রকার অনিষ্ট

প্রথম প্রকার অনিষ্ট হইল প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার আশংকা, এই ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে না। এই পর্যায়ে আমরা উপরে আলোচিত মানুষের চাহিদার চারিটি বিষয়ের মধ্যে এই জাতীয় অনিষ্টের আশংকার উদাহরণ পেশ করিব।

(এক) এলেমের অনিষ্টের আশংকাঃ মনে করুন, কোন ব্যক্তি তাহার উস্তাদের ঘনিষ্ঠজনদেরকে অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়াও এই আশংকায় বাধা দেয় না যে, এইরূপ করিলে হয়ত সেই ব্যক্তি আমার উস্তাদের নিকট গিয়া আমার নামে বদনামী করিবে এবং উহার ফলেই তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে শিক্ষা দান হইতে বিরত থাকিবেন।

(দুই) স্বাস্থ্যের অনিষ্টের আশংকাঃ উহার উদাহরণ হইল– যেমন এক ব্যক্তি কোন চিকিৎসকের নিকট গেল এবং তাহার গায়ে রেশমী পোশাক দেখিয়াও এই আশংকায় তাহাকে কিছু বলিল না যে, সে মনে করিল, আজ তাহাকে এই কাজে বাধা দেওয়ার পর অভিষ্যতে কোন দিন যদি আমি তাহার নিকট চিকিৎসার জন্য আসি, তবে নিশ্চয়ই তিনি আমার চিকিৎসা করিবেন না।

(তিন) সম্পদের অনিষ্টের উদাহরণ এইরূপঃ শাসনকর্তা, আমীর উমারা ও বিত্তবানদিগকে অন্যায় করিতে দেখিয়াও কেবল এই আশংকায় বাধা না দেওয়া যে, হয়ত উহার ফলে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষ হইতে আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হইয়া যাইবে।

(চার) প্রভাবের ক্ষেত্রে উদাহরণঃ কোন মানুষকে অপরাধ করিতে দেখিবার পরও কেবল এই কারণে বাধা না দেওয়া এবং দেখিয়াও না দেখার ভান করা যে, এইরূপ করিলে হয়ত ভবিষ্যতে আমি তাহার সহযোগিতা ও সমর্থন হারাইব এবং তাহার সমর্থনের অভাবে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইব।

উপরে যেই চারি প্রকার আশংকার কথা উল্লেখ করা হইল, এইসব আশংকার কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকা যাইবে না। কেননা, বর্ণিত উদাহরণ সমূহে কতক অনাবশ্যক ও বাহুল্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত বিষয় হইতে বঞ্চিত হওয়া ইহা অপ্রাকৃত। অর্থাৎ ইহাকে প্রকৃত অনিষ্ট বলা যাইবে না। কেননা, প্রকৃত অনিষ্ট

হইল– নিজের মালিকানাধীন কোন বস্তু বিনষ্ট হওয়া। অবশ্য এইসব অতিরিক্ত ও বাহুল্য বিষয় সমূহের মধ্যে কেবল এমন কতক বিষয়কে 'ব্যতিক্রম' মনে করা যাইবে যাহা মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য এবং যাহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার 'অনিষ্ট' সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বর্জন করার 'অনিষ্ট' অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রমাণিত। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়া তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার আশা আছে। সেই সঙ্গে তাহার ইহাও জানা আছে যে, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে বিলম্ব হইলে তাহার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হইয়া বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটিতে পারে। এখানে 'জানা আছে' দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হইল, 'জন্নে গালেব' বা প্রবল ধারণা। অর্থাৎ ইহা এমন ধারণা যেই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া পানির ব্যবহার বর্জন করিয়া তাইয়াম্মুম করা বৈধ হয়। তো এই ক্ষেত্রেও যদি এইরূপ প্রবল ধারণা হয়, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে। ইহা হইল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অনিষ্টের উদাহরণের ব্যাখ্যা।

এলেমের ক্ষেত্রে অনিষ্টের উদাহরণের ব্যাখ্যা হইল– মনে করুন, এক ব্যক্তি দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাস ও মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ। এদিকে গোটা এলাকার মধ্যে কেবল এমন একজন আলেম আছেন যিনি তাহাকে এইসব বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। অর্থাৎ এলাকায় আরো কতক আলেমও আছেন বটে, কিন্তু তাহাদের নিকট সে গমন করিতে সক্ষম নহে। এই ব্যক্তি ইহাও জানে যে, সে যেই ব্যক্তির উপর 'নেহী আনিল মুনকার' করিতে চাহিতেছে, সে ঐ আলেমের ঘনিষ্ঠজন এবং সে ইচ্ছা করিলেই ঐ আলেমকে এই বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে যে, তিনি যেন তাহাকে দ্বীনের এলেম শিক্ষা দান হইতে বিরত থাকেন। অর্থাৎ এই পর্যায়ে এখানে দুইটি নিষিদ্ধ বিষয় একত্রিত হইল। প্রথমতঃ ধর্মীয় জ্ঞান বা দ্বীনের জরুরী মাসায়েল হইতে অজ্ঞ থাকা– ইহাও নিষিদ্ধ। এমতাবস্থায় কেয়াসের দাবী হইল, কোন একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া। অন্যায় কর্মটি যদি নেহায়েতই ঘৃণ্য হয়, তবে উহা প্রতিরোধ করাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্বীনের এলেম হাসিল করার বিষয়টি যদি তদাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাখ্যা হইলঃ মনে করুন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি কামাই-রোজগার করিতে অক্ষম এবং মানুষের নিকট হাত পাতারও তাহার অভ্যাস নাই। এদিকে আসবাবের উসিলা বর্জন করিয়া কেবল আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার আত্মিক শক্তিও তাহার অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় শহরের একমাত্র ব্যক্তিটি যে তাহার ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে, তাহার অন্যায় কাজে যদি সে বাধা দেয় তবে এমন আশংকা আছে যে, সে হয়ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া সাহায্য বন্ধ করিয়া

দিবে। ফলে বাধ্য হইয়া হয় তাহাকে হারাম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে কিংবা অভাবের তাড়নায় তাহার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে। এমন অপারগ ক্ষেত্রেও অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকা যাইবে।

প্রভাবের ক্ষেত্রে অনিষ্টের ব্যাখ্যাঃ মনে করুন, কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক হয়ত কোন আদেশ-নিষেধকারী ব্যক্তির পিছনে লাগিয়া আছে। কিভাবে তাহাকে জ্বালাতন করা যায় এই তাহার ফিকির। এখন এই দুষ্ট লোকের অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হইল, বাদশাহর দরবারে হাজির হইয়া এই বিষয়ে তাহার নিকট অভিযোগ করা। কিন্তু বাদশাহর দরবারে গমন করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। তবে একমাত্র যেই ব্যক্তিটি তাহাকে এই কাজে সহযোগিতা করিতে পারে, সেই লোকটি শরীয়ত গর্হিত বিবিধ কর্মে লিপ্ত। এখন সেই ব্যক্তিকে যদি এই কাজে বাধা দেওয়া হয়, তবে সে এই কাজে তো তাহাকে সহযোগিতা করিবেই না, বরং এই ক্ষেত্রে এমনও আশংকা আছে যে, লোকটি হয়ত তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহর নিকট পাল্টা তাহার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করিয়া বসিবে। এমন পরিস্থিতিতেও অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে।

মোটকথা, এই জাতীয় অপারগতা ও জরুরতের ক্ষেত্রে উহাকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করা হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে অপারগতা ও জরুরত কোন্‌টি তাহা অন্যায় প্রতিরোধকারীর ইজতিহাদের উপর নির্ণিত হইবে। অর্থাৎ এইরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের মনের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিবে। এক দিকে নিজের অক্ষমতাজনিত জরুরত এবং অপর দিকে মুনকার তথা অসৎ কর্মটি যঘন্যতা– এই দুইটি বিষয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইবে। অতঃপর পরিপূর্ণ সততা ও আমানতদারীর সহিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তুলনা করিয়া যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিবে। এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যেন কোন অবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য না পায় তৎপ্রতি সতর্ক থাকিবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জনপূর্বক নীরব থাকার নাম বিনয়। আর নিজের ব্যক্তি স্বার্থের কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার নাম শঠতা। এই ক্ষেত্রটি অত্যন্ত জটিল ও নাজুক। সুতরাং মোমেনের কর্তব্য হইল, এহেন পরিস্থিতির প্রতিটি মুহূর্তে নিজের আত্মা ও কলবের নেগরানী করা। মনে মনে এইরূপ কল্পনা করা যে, আল্লাহ পাক আমাদের দিলের হালাত দেখিতেছেন এবং আমাদের প্রতিটি কাজের হাকীকত সম্পর্কে তিনি অবগত। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির আনুগত্য করিতেছি, না নিজের স্বার্থের আনুগত্য করিতেছি, এই সব বিষয় তাহার নিকট গোপন রাখিবার কোন উপায় নাই। তাঁহার নিকট প্রতিটি নেক আমল ও বদ আমলের প্রতিদান বিদ্যমান এবং এই বিষয়ে তিনি কোনরূপ অবিচার করেন না।

দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট

দ্বিতীয় প্রকার অনিষ্ট হইল, নিজের মালিকানাধীন কোন সম্পদ নষ্ট হইয়া যাওয়া। ইহা প্রকৃত অনিষ্ট বটে। ইতিপূর্বে মানুষের চাহিদার যেই চারিটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে কেবল এলেম ব্যতীত অপর তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহা "অন্যায়ের প্রতিরোধ" রহিত হওয়ার কারণ হইতে পারে। এলেম এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হইল, এলেম আল্লাহ পাকের দেওয়া এক নেয়মত। কোন মানুষ এই নেয়মতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিলেই কাহারো এলেম ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে মূর্খতায় নিক্ষেপ করিতে পারে না। এই এলেমের ফজিলত এমনই অন্তহীন যে, দুনিয়াতে যেমন এই এলেমের কোন বিনাশ নাই; তদ্রূপ আখেরাতেও উহার স্থায়ী সুফল ভোগ করা যাইবে।

প্রহার ও শারীরিক নির্যাতনের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং কোন মানুষ যদি ইহা জানিতে পারে যে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গেলে তাহার উপর কঠিন নির্যাতন করা হইবে এবং উহার ফলে সে চির দিনের জন্য পঙ্গুও হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব নহে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে তাহা মোস্তাহাবের পর্যায়ে থাকিবে।

সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ব্যাখ্যা হইলঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পূর্বাহ্নে এই বিষয়ে অবগত হওয়া যে, আমি যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে তৎপর হই, তবে আমার বিষয়-সম্পদ লুট করা হইবে কিংবা আমার বাড়ী-ঘর ও ফসলাদি জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে ইত্যাদি। তো এইরূপ পরিস্থিতিতে নেহী আনিল মুনকার ওয়াজিব হইবে না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও তাহা মোস্তাহাবের পর্যায়ে থাকিবে। তবে সর্বাবস্থায় যেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহা এই যে, একজন মোমেনের ঈমানের দাবী হইল, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকা।

এখানে আরেকটি জরুরী বিষয় হইল, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে গিয়া আঘাত পাওয়া বা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়টি এক পর্যায়ের নহে। বরং উহারও কতক শ্রেণী রহিয়াছে। অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণ যদি নেহায়েতই মামুলী হয়, যেমন প্রতিপক্ষ হয়ত তাহার দুই/চার পয়সা ছিনাইয়া লইল বা মামুলী ধরনের একটি থাপ্পড় দিল ইত্যাদি। তো এই জাতীয় ক্ষতির কোন পরওয়া করা যাইবে না এবং এইরূপ ওজরের কারণে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই। কিন্তু এই ক্ষতির পরিমাণ যদি যথার্থই মারাত্মক হয়, তবে এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতে বিরত থাকার বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা হইবে। আরেকটি ক্ষতি হইল মধ্যম পর্যায়ের।

অর্থাৎ ক্ষতির পরিমাণটি নেহায়েত মামুলীও নহে আবার তেমন মারাত্মকও নহে; এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করা যাইবে কিনা, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব কঠিন। সুতরাং দ্বীনদার-পরহেজগার ব্যক্তি নিজের সঠিক ইজতিহাদ ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের পর যথাসম্ভব দ্বীনকে প্রাধান্য দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে গিয়া নিজের ইজ্জত ও সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়ার উদাহরণ এইরূপ– মনে করুন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজের একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কারণে প্রকাশ্য লোকসমাগমে তাহাকে মারধর করা হইল। অকথ্য ভাষায় তাহাকে গালাগাল করা হইল এবং তাহার রুমালটি গলায় জড়াইয়া শহরের অলিগলিতে ঘুরানো হইল। তাহার চেহারায় কালি লেপনপূর্বক গাধার পিঠে চড়াইয়া তামাশা করা হইল।

কিন্তু তাহাকে যদি ভয়ানক মারধর করা হইয়া থাকে, তবে ইহা তাহার স্বাস্থ্য বিনষ্টের উদাহরণ। অবশ্য শারীরিক নির্যাতন যদি মামুলী ধরনের হয়, তবে উহার ফলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে না বটে, কিন্তু উহার ফলেও যথেষ্ট মানহানী ঘটে। অর্থাৎ এইরূপ মামুলী প্রহারে সাধারণতঃ দেহের উপর বিশেষ কষ্ট না হইলেও মনের উপর তাহা প্রচণ্ডভাবেই ক্রিয়া করে এবং মানসিক যাতনা দেহের উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তো অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে গিয়া মানহানীর শিকার হওয়ারও কয়েকটি স্তর রহিয়াছে। উহার যেই স্তরটিকে আমরা 'বেইজ্জতি' বলিয়া অভিহিত করিব, উহা হইল– অন্যায়ের প্রতিরোধ করার কারণে মুখে চুন-কালি মাখিয়া খালী পা ও খালী মাথায় শহরের অলিগলিতে ঘুরানো ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করার অনুমতি আছে। কেননা, শরীয়তে নিজের ইজ্জত হেফাজতের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অপমান ও মানহানীর বিষয়টি যে কোন অনিষ্ট অপেক্ষা গুরুতর।

দ্বিতীয় স্তর হইল, ইজ্জত ও সম্মান মুলতবী হওয়া কিন্তু বেইজ্জতি না হওয়া। উদাহরণ স্বরূপঃ এক ব্যক্তি বেশ সাজ-গোজ করিয়া উত্তম পোশাক পরিধান পূর্বক ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া পথে বাহির হইয়াছে। এই ব্যক্তি ইহা ভাল করিয়া জানে যে, আমি যদি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করি, তবে আমাকে ঘোড়া ত্যাগ করিয়া সাধারণ পোশাকে পথ চলিতে হইবে। অথচ এইভাবে চলিতে সে অভ্যস্থ নহে। এখন এই উত্তম পোশাক ও সওয়ারী অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে গণ্য এবং শরীয়তে ইহা পছন্দনীয় নহে। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধের কারণে এইসব বিষয় তরক করিতে হইলেও কোন

পরওয়া করা যাইবে না। নিজের ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজত করা উত্তম বটে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাহুল্যতার হেফাজতে নিমগ্ন হওয়া পছন্দনীয় নহে।

অনুরূপভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিলে মানুষ আমাকে তিরস্কার করিবে, আহাম্মক-নির্বোধ ও রিয়াকার বলিয়া মন্তব্য করিবে, আমার গীবত করা হইবে, আমার ভক্ত-অনুরক্ত ও স্বজনদিগকে আমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তোলা হইবে– ইত্যাদি অজুহাতের কারণেও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব এড়ানো যাইবে না। কেননা, সত্যিকার অর্থে ইজ্জত-সম্মানের ক্ষেত্রে এইগুলি এমন বাহুল্য বিষয় যার সংরক্ষণ আবশ্যক নহে। কেননা, কোন তিরস্কারকের তিরস্কার, গীবতকারীর গীবত এবং মানুষের অন্তর হইতে ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পাওয়ার আশংকায় যদি আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার বর্জন শুরু হয়, তবে তো শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ আমলটির অস্তিত্বই বিলীন হইয়া যাইবে। কেননা, একমাত্র গীবত ব্যতীত অন্য সকল অসৎ কর্মের ক্ষেত্রেই উহার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রে 'গীবত' ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হইল, অন্যায় প্রতিরোধকারী যদি ইহা জানিতে পারে যে, আমার নিষেধের কারণে তো সে মানুষের গীবত করা হইতে বিরত হইবেই না, বরং আমার এই বলার কারণে সে হয়ত আমার নামেই আরো অধিক পরিমাণে গীবত করিতে থাকিবে; তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে বাধা দেওয়া হারাম হইবে। কারণ এই ক্ষেত্রে "অন্যায়ের প্রতিরোধ" গোনাহের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে উহা বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। অবশ্য যদি এইরূপ হয় যে, আমার বারণের কারণে সে যেই ব্যক্তির গীবত করিতেছিল সেই ব্যক্তির গীবত করা হইতে নিবৃত হইবে বটে, কিন্তু উহার পরিবর্তে সে আমার গীবত করিতে শুরু করিয়া দিবে– তবে এই ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ ওয়াজিব হওয়ার পরিবর্তে মোস্তাহাব হইবে। কেননা, নিজের ইজ্জতের হেফাজত অপেক্ষা অপরের ইজ্জতের হেফাজত করা অধিক ছাওয়াবের কাজ। পরোপকার ও মানব হিতৈষিতার দাবীও ইহাই।

মোটকথা, শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, ইহতিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব। আর অসৎ কাজ দেখিয়া নীরব থাকা বিপদজনক। তবে ইহ্তিসাবের ক্ষেত্রে যদি উপরের বিবরণ অনুযায়ী নিজের জান-মাল ও ইজ্জত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নিশ্চিত আশংকা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে উহা হইতে বিরত থাকা যাইবে। কিন্তু নিজের ইজ্জত ও মর্যাদার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক উপাদান যেহেতু শরীয়তে কাম্য নহে; সুতরাং উহা বিনষ্ট হওয়ার 'ক্ষতি' অন্যায় দেখিয়াও নীরব থাকার ক্ষতির পরিপূরক হইতে পারে না।

আদেশ-নিষেধের ফলে নিজের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা

এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, অপরের ক্ষতি অপেক্ষা নিজের ক্ষতির কারণেই মানুষ অধিক কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। সুতরাং এই হিসাবে বলা যায়, যেই ব্যক্তিকে অসৎ কাজ হইতে বারণ করা হয় সেই ব্যক্তি যদি সৎ কাজের আদেশদাতার পরিবর্তে তাহার কোন ঘনিষ্ঠজন (যেমন, তাহার মা-বাবা ও সন্তান ইত্যাদি)-কে কষ্ট দেয়, তবে এই ক্ষেত্রে "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" রহিত না হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং উহার নীতিমালা যেহেতু নিজের হকের তুলনায় অপরের হককে অধিক গুরুত্ব দিয়াছে, এই কারণে আদেশ ও নিষেধকারী ব্যক্তি নিজের বেলায় সহনশীল হওয়ার সুযোগ আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা যেন অপরের হক কোনভাবেই নষ্ট না হয় এবং কোন অবস্থাতেই যেন সে অপরের কষ্টের কারণ না হয়, এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ অপরের হক নষ্ট করা বা অপরের কষ্টের কারণ হওয়া কোনভাবেই তাহার পক্ষে জায়েজ হইবে না। সুতরাং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিলে যদি তাহার স্বজন ও পরিবারের সদস্যগণ কোনরূপ কষ্ট ও ক্ষতির শিকার হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা বর্জন করা কর্তব্য। কেননা, এই ক্ষেত্রে যেন একটি অন্যায় দমন করিতে গিয়া অপর একটি অন্যায়ের জন্ম দেওয়া হইবে। শরীয়তের বিধান হইল, কোন মুসলমানের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমোদন ছাড়া এমন কোন কাজ করা বৈধ নহে, যেই কাজের কারণে সেই ব্যক্তি কোনরূপ অনিষ্ট ও ক্ষতির শিকার হইতে পারে।

সারকথা হইল, এইরূপ যদি আশংকা হয় যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ফলে আমি নিজে হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হইব না, কিন্তু উহার কারণে আমার আপন লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধ না করা উত্তম। উহার উদাহরণ যেন এইরূপঃ জনৈক ব্যক্তি আল্লাহতে নিবেদিত হইয়া এমনভাবে দুনিয়া ত্যাগ করিল যে, অবশেষে তাহার নিকট পার্থিব বিষয়-সম্পদ বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। অবশ্য তাহার ঘনিষ্ঠ লোকেরা প্রচুর অর্থ-বিত্ত ও বিষয়-সম্পদের মালিক এবং তাহাদের অনেকেই সরকারের বিভিন্ন উচ্চ পদে সমাসীন। এখন সেই সংসার ত্যাগী লোকটি বিষয়-সম্পদের অভাবে নিজের কোন ক্ষতির আশংকা করিতেছে না বটে, কিন্তু তাহার আশংকা হইল, আমি যদি বাদশাহকে অসৎ কাজে নিষেধ করি, তবে তিনি আমার উপর সৃষ্ট ক্রোধ আমার আপনজনদের উপরই প্রকাশ করিবেন। উহা এইরূপে যে, তাহাদের বিষয়-সম্পদ ছিনাইয়া লওয়া হইবে, শারীরিকভাবে

নির্যাতন করা হইবে এবং সরকারী পদ হইতে তাহাদিগকে অপসারণ করা হইবে। অর্থাৎ বাদশাহ বিবিধ উপায়ে তাহাদের উপর নির্যাতন করিবেন। তো এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধ বর্জন করা উচিত। কেননা, কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ– যেমন কোন অপরাধ দেখিয়া নীরব থাকা নিষেধ। অবশ্য নিজের লোকজনের জান-মাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিশেষ কোন আশংকা যদি না থাকে এবং শুধুমাত্র এইরূপ আশংকা হয় যে, আমার কারণে তাহাদিগকে কেবল ডাঁট-ধমক ও গালমন্দ করা হইবে; তবে এই অবস্থায় "অসৎ কাজে বারণ" করা যাইবে। এই ক্ষেত্রেও ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সেই গালমন্দ খুব যঘন্য কিনা এবং উহার ফলে তাহাদের মানহানী ঘটিয়া তাহারা উদ্বেগজনক মানসিক পীড়ন অনুভব করিবে কিনা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাধা দান ও শক্তি প্রয়োগ

উপরে অন্যায়ের প্রতিরোধ সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হইল, কাহাকেও কোন অন্যায় করিতে দেখিয়া শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করা যাইবে কিনা? মনে করুন, এক ব্যক্তি তাহার হাত-পা কিংবা অন্য কোন অঙ্গ কর্তন করিতেছে। এখন অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি ইহা জানে যে, এই ব্যক্তিকে মৌখিক বাধা দিলে তাহাতে কোন কাজ হইবে না। বরং এই কাজ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইলে তাহার সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে। আবার এই লড়াইয়ে তাহার প্রাণহানীও ঘটিতে পারে। তো এই পরিস্থিতিতে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করা যাইবে কিনা? যদি বলা হয়, হাঁ। তবে পাল্টা প্রশ্ন দেখা দিবে, যেই ক্ষেত্রে লোকটির একটি অঙ্গ কর্তন করা সঙ্গত মনে করা হইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে হত্যা করা কেমন করিয়া বৈধ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব হইল, প্রথমে সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করিতে হইবে যেন সে তাহার অঙ্গ কর্তন না করে। যদি এই নিষেধাজ্ঞা সে অমান্য করে, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার উপর শক্তি প্রয়োগ করা হইবে– যদিও এই শক্তি প্রয়োগ ও লড়াইয়ের ফলে সে প্রাণ হারায়। কারণ, এখানে মূল উদ্দেশ্য লোকটির অঙ্গ বা তাহার প্রাণ রক্ষা করা নহে; বরং মূল উদ্দেশ্য হইল, একটি অন্যায় ও পাপ দমন করা। কিন্তু এই ঘটনায় অন্যায়ের প্রতিরোধের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিহত হওয়া পাপ নহে, বরং পাপ হইল তাহার নিজের অঙ্গ কর্তন করা।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ মনে করুন এক ব্যক্তি জোর পূর্বক কোন মুসলমানের সম্পদ ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার উপর আক্রমণ করিল। এখন সেই মুসলমান যদি নিজের সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেই

www.eelm.weebly.com

অন্যায় আক্রমণ পতিহত করে, আর এই উদ্যোগের ফলে আক্রমণকারী প্রাণ হারায়– তবুও এই উদ্যোগ জায়েজ হইবে। এই উদ্যোগে কোন পাপ হইবে না এবং এইরূপও বলা যাইবে না যে, উক্ত মুসলমান নিজের সম্পদ রক্ষার জন্য আক্রমণকারীকে হত্যা করিয়াছে। বরং এই ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা হইল, কোন মুসলমানের সম্পদ লুণ্ঠন করা পাপ; আর এই পাপ প্রতিরোধ করার পরিণামে যদি লুণ্ঠনকারী প্রাণ হারায় তবে এই হত্যাকাণ্ডে কোন পাপ হইবে না। ইহা বরং পাপ দমন করার একটি উদ্যোগমাত্র। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও কেবল এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া কাহারো উপর আক্রমণ করা জায়েজ হইবে না যে, লোকটি মানুষের দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই সে হয়ত নিজের হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে, সুতরাং তাহাকে পূর্বাহ্নেই হত্যা করিয়া ফেলা ভাল যেন সেই পাপ অনুষ্ঠানের সুযোগই না থাকে। শরীয়তে এইরূপ হত্যাকাণ্ডের অনুমতি নাই। কেননা, ইহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নহে যে, লোকচক্ষুর অন্তরাল হইলেই সে এইরূপ পাপ করিবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতিমালা হইল, কেবল পাপের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করিয়াই কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

গোনাহের তিনটি শ্রেণী

প্রকাশ থাকে যে, পাপ ও গোনাহের তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে–

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকার গোনাহ হইল এমন যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই জাতীয় গোনাহ বা অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্টভাবে দেওয়া হইবে। এই শাস্তি প্রয়োগ করিবেন শাসনকর্তা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই শাস্তি প্রদানের কোন অধিকার নাই।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দ্বিতীয় প্রকার গোনাহ হইল এমন যাহা বর্তমানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত রেশমী কাপড় পরিধান করিয়া আছে বা শরাব পানের উদ্দেশ্যে উহার পাত্র হাতে লইয়া রাখিয়াছে। এইরূপ অপরাধ যে কোনভাবে দমন করা ওয়াজিব। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অপরাধ দমনের পদ্ধতিটি আবার সেই অপরাধের অনুরূপ কিংবা উহা অপেক্ষা যঘন্য হইয়া না পড়ে। এইরূপ অপরাধ সাধারণ মানুষও দমন করিতে পারিবে।

তৃতীয় প্রকার

তৃতীয় প্রকার হইল এমন অপরাধ যাহা এখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই, তবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন, এক ব্যক্তি হয়ত শরাব পানের আসরের উদ্দেশ্যে একটি রং মহল প্রস্তুত করিতেছে। তো এখানে অপরাধ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা

সন্দেহযুক্ত। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, কোন প্রতিবন্ধকের কারণে অবশেষে সেই অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হইল না। এইরূপ অবস্থায় কেবল মৌখিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপ হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া যাইবে। অর্থাৎ এই সম্ভাব্য অপরাধের কারণে তাহাকে তিরস্কার করা বা মারধর করার এখতিয়ার সাধারণ মানুষেরও নাই এবং শাসকশ্রেণীরও নাই। অবশ্য লোকটি যদি শরাবের আসর সাজাইয়া সকল কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং এইভাবে আসর জমাইয়া শরাব পান করায় সে পূর্ব হইতেই অভ্যস্ত হইয়া থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে বারণ করা কর্তব্য। কেননা, ইতিমধ্যেই সে উহার যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া কেবল শরাবের অপেক্ষা করিতেছে এবং যথাসময় উহার আমদানীও প্রায় নিশ্চিত। এমতাবস্থায় মৌখিক বারণ যদি কার্যকর না হয়, তবে মারধর ও বল প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা যাইবে।

উপরোক্ত অবস্থার উদাহরণ যেন এইরূপঃ মনে করুন, কতক বখাটে যুবক মহল্লায় অবস্থিত মহিলাদের গোসলখানার আশেপাশে জটলা বাঁধিয়া সেখানে মহিলাদের প্রবেশ ও বহির্গমন দেখিতেছে। অবশ্য তাহারা মহিলাদের পথরোধ কিংবা তাহাদিগকে কোনরূপ উত্ত্যক্ত করে না বটে। এখন কোন ব্যক্তি যদি যুবকদিগকে তথায় দাঁড়াইতে নিষেধ করে এবং এই বিষয়ে কঠোরতাও আরোপ করে তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। কেননা, যুবকরা এমন স্থানে দাঁড়াইয়াছে, যেখানে দাঁড়ানোই অপরাধ– যদিও তাহাদের মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য না থাকে। যেমন, কোন বেগানা নারীর সঙ্গে একান্তে অবস্থান পাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনার কারণেই তাহা পাপ। "পাপ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা" দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য এমন কর্ম যাহা দ্বারা পাপ অনুষ্ঠানের সুযোগ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিরোধকে "সম্ভাব্য পাপের প্রতিরোধ" বলা যাইবে না। বরং ইহা যথার্থই উপস্থিত পাপের প্রতিরোধ।

ইহ্‌তিসাবের দ্বিতীয় পর্যায়

উপরোক্ত সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকারের প্রথম পর্যায়ের শর্তসমূহ এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা উহার দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তসমূহ আলোচনা করিব। এই শর্ত সমূহের মধ্যে রহিয়াছে– (১) যেই কর্মটিকে নিষেধ করা হইবে তাহা গর্হিত হওয়া (২) গর্হিত কর্মটি উপস্থিত বিদ্যমান হওয়া (৩) গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হওয়া (৪) কোনরূপ ইজতিহাদ ছাড়াই ইহা জানা যে, কর্মটি গর্হিত। নিম্নে আমরা পৃথক পৃথকভাবে উহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রথম শর্তঃ কর্মটি গর্হিত হওয়া

প্রথম শর্ত হইতেছে সেই কর্মটি গর্হিত হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তে তাহা নিষিদ্ধ হওয়া। এখানে আমরা গোনাহ শব্দের পরিবর্তে 'গর্হিত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। কেননা, গর্হিত শব্দটি গোনাহ অপেক্ষা ব্যাপক। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন বালক বা উম্মাদকে শরাব পান করিতে দেখে, তবে উহাতে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। অথচ বালক ও উম্মাদের পক্ষে শরাব পান করা গোনাহ নহে। অর্থাৎ বালক ও উন্মাদের উপর যেহেতু শরীয়তের কোন বিধিবিধান কার্যকর নহে, এই কারণে শরাব পান তাহাদের জন্য গোনাহ নহে বটে, কিন্তু তাহা গর্হিত হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তো গোনাহ শব্দের পরিবর্তে গর্হিত শব্দটি আমরা এই কারণে ব্যবহার করিয়াছি যে, এই শব্দটি যাবতীয় অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে। মনে করুন, আমরা যদি গোনাহ শব্দটি ব্যবহার করিতাম, তবে বালক ও উম্মাদের শরাব পানের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যাইত না। কেননা, তাহাদের জন্য তো উহা পান করা গোনাহ নহে। আর গর্হিত শব্দটি এমনই ব্যাপক যে, উহা কবীরা ও ছগীরা উভয় গোনাহের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হইতে পারে। অন্যায়ের প্রতিরোধ তো কেবল কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং কোথাও ছগীরা গোনাহ হইতে দেখিলেও বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেমন– গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া, বেগানা নারীর সঙ্গে একান্তে অবস্থান করা এবং তাহাদের দিকে তাকানো এইসবই ছগীরা গোনাহ। কিন্তু তবুও উহাতে বারণ করা কর্তব্য।

দ্বিতীয় শর্তঃ গর্হিত কর্মটি বর্তমানে বিদ্যমান হওয়া

দ্বিতীয় শর্ত হইল, গর্হিত কর্মটি আপাতত বিদ্যমান হওয়া। অর্থাৎ যাহা

অতীত হইয়া গিয়াছে কিংবা ভবিষ্যতে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে– এমন গর্হিত কর্মের জন্য বারণ করা যাইবে না। যেমন এক ব্যক্তি শরাব পান সম্পন্ন করিয়াছে। এখন এই অপরাধের জন্য তাহাকে যেকেহ তিরস্কার করিতে পরিবে না। কেননা, এই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একটি হুকুম অমান্য করিয়াছে। সুতরাং এই অপরাধের জন্য আল্লাহ পাক যেই শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, শাসনকর্তার পক্ষ হইতে তাহা প্রয়োগ করা হইবে। অর্থাৎ এই বিষয়ে যেকেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অনুরূপভাবে সম্ভাব্য অপরাধের উদাহরণ হইলঃ মনে করুন, কোন লক্ষণ দ্বারা জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব পান করিবে। এখন এই ক্ষেত্রে তো এই সম্ভাবনাও আছে যে, কোন প্রতিবন্ধকের কারণে সে হয়ত শরাব পান করিবে না। সুতরাং এমতাবস্থায় কেবল মৌখিকভাবে তাহাকে উপদেশ দেওয়া যাইবে। আর ইহাও কেবল তখনই করা যাইবে যখন সে তাহার ইচ্ছার কথা অস্বীকার না করিবে। অর্থাৎ সে যদি অস্বীকার করিয়া বলে যে, "আমি শরাব পান করিব না" তখন তাহাকে মৌখিকভাবেও উপদেশ দেওয়ার অনুমতি নাই। কেননা, এইরূপ করিলে একজন মুসলমানের প্রতি কুধারণা পোষণ করা হইবে।

তৃতীয় শর্তঃ গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই প্রকাশ হওয়া

তৃতীয় শর্ত হইতেছে, গর্হিত কর্মটি কোনরূপ অনুসন্ধান ও খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিষেধকারীর নিকট প্রকাশ হওয়া। সে মতে কোন ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর দরজা বন্ধ করিয়া কোন অপরাধ করে, তবে উহা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তৎপর হওয়া জায়েজ নহে। কেননা, আল্লাহ পাক মানুষের দোষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে নিষেধ করিয়াছেন।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির বাড়ীর দেয়ালে উঠিয়া তাহার ঘরের ভিতর দৃষ্টি দিলেন। বাড়ীর মালিক তখন ঘরের ভিতর কোন অন্যায় কর্মে লিপ্ত ছিল। তিনি লোকটিকে এই বিষয়ে বারণ করিলে সে আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আল্লাহ পাকের একটি নাফরমানী করিতেছি আর আপনি একই সঙ্গে আল্লাহর তিনটি হুকুম অমান্য করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ পাকের সেই তিনটি হুকুম কি? লোকটি আরজ করিল, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

وَلَا تَجَسَّسُوْا

অর্থঃ "এবং গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করিও না।" (সূরা হুজুরাতঃ আয়াত ১২)

অথচ আপনি গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে আমার দোষ তালাশ করিতেছেন। আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় হুকুম হইল–

وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

অর্থঃ "আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়া।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮৯)

অথচ আপনি দেয়ালের উপর দিয়া তাশরীফ আনিয়াছেন। আপনার কর্তব্য ছিল যথারীতি দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করা। আল্লাহ পাকের তৃতীয় হুকুম হইল–

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

অর্থঃ "তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কোন গৃহে প্রবেশ করিও না, যেই পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদিগকে ছালাম না কর।"

(সূরা নূরঃ আয়াত ২৭)

অথচ আপনি না ছালাম করিয়াছেন, না ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছেন। এই কথা শুনিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) গৃহবাসীকে আর কিছুই বলিলেন না এবং সে এই অপরাধ হইতে তওবা করিয়া লইবে– এই ওয়াদার উপর তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মিম্বরে দাঁড়াইয়া ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শাসনকর্তা যদি নিজ চোখে কোন অপরাধ দেখে, তবে কি তিনি অপর কোন সাক্ষী ব্যতীতই হদ (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করিতে পারিবেন? হযরত আলী (রাঃ) ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, হদ্ কায়েমের জন্য শাসনকর্তার একক প্রত্যক্ষ যথেষ্ট নহে। বরং এই ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষী আবশ্যক হইবে।

গর্হিত কর্ম প্রকাশ্য ও গোপন হওয়ার সংজ্ঞা

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গর্হিত কর্ম প্রকাশ্য ও গোপন হওয়ার সংজ্ঞা কি? উহার জবাব হইল কোন ব্যক্তি যদি দেয়ালের আড়ালে বা ঘরের ভিতরে চলিয়া যায়, তবে কেবল তাহার অপরাধ জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা অনুমতিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করা নিষেধ। কিন্তু বাহির হইতে যদি জানা যায় যে, ঘরের ভিতরে কোন পাপ কর্ম হইতেছে; যেমন বাহির হইতে যদি ঘরের ভিতরের বাঁশির আওয়াজ বা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যায় কিংবা তাহাদের কথাবার্তা দ্বারা ইহা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, ঘরের ভিতর তাহারা শরাব পান করিতেছে, তবে এই ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে ভিতরে

প্রবেশ করিয়া ঐসব জিনিস নষ্ট করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে।

আওয়াজ ও শব্দ দ্বারা যেমন গর্হিত কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তদ্রূপ গন্ধ দ্বারাও উহা টের পাওয়া যায়। যেমন শরাবের গন্ধ দ্বারাও ঘরের বাহির হইতে উহার উপস্থিতি অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, ইহা গৃহে রক্ষিত শরাবের গন্ধ এবং এখন উহা পান করা হইতেছে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে গৃহে প্রবেশ করা এবং শরাব ফেলিয়া দেওয়ার অনুমতি নাই। পক্ষান্তরে ঘরের বাহির হইতে অনুভূত শরাবের গন্ধ এবং আনুসঙ্গিক অন্য কোন লক্ষণ দ্বারা যদি ইহা অনুভব করা যায় যে, ইহা রক্ষিত শরাবের গন্ধ নহে, বরং ঘরের লোকেরা এখন উহা পান করিতেছে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া উহা ফেলিয়া দেওয়া যাইবে।

অনেক সময় মানুষের দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে জামা বা আস্তিনের ভিতর শরাবের বোতল বা অন্য কোন অবৈধ ও গর্হিত দ্রব্য লুকাইয়া রাখা হয়। পথে যদি কোন ফাসেক ব্যক্তিকে এইরূপ করিতে দেখা যায়, তবে যতক্ষণ না কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা উহার অবৈধতা নিশ্চিত হওয়া যাইবে, ততক্ষণ উহা খুলিয়া দেখা জায়েজ নহে। কেননা, কোন ব্যক্তি ফাসেক ও পাপী হইলেই ইহা জরুরী নহে যে, সে জামার ভিতর বা আস্তিনের ভিতর যাহাকিছু লুকাইয়া লইয়া যাইবে, উহাই অবৈধ দ্রব্য হইবে। কারণ, ফাসেকের পক্ষে তো কোন সঙ্গত কারণেও সিরকা বা শরবতের বোতল লুকাইয়া লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

মোটকথা, যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কাপড়ের নীচে শরাবের বোতল আছে, তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে। কিন্তু তাহাকেও এই কথা বলা যাইবে না যে, তোমার বোতলটি বাহির কর, আমি দেখিব উহাতে শরাব আছে কিনা? কেননা, এইরূপ করিলে তাহা "গুপ্ত বিষয় অনুসন্ধান" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে– যাহা নিষিদ্ধ।

চতুর্থ শর্তঃ ইজতিহাদ ছাড়াই গর্হিত বিষয় অবগত হওয়া

চতুর্থ শর্ত হইল, কোনরূপ ইজতিহাদ ছাড়াই ইহা অবগত হওয়া যে, বিষয়টি অনিষ্টকর ও গর্হিত। সুতরাং কোন বিষয় যদি ইজতিহাদ নির্ভর হয়, অর্থাৎ বিষয়টি গর্হিত কিনা এই বিষয়ে যদি ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নিষেধ করা যাইবে না। যেমন, হানাফী মাজহাবের অনুসারীর পক্ষে ইহা জায়েজ নহে যে, সে কোন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীকে এমন প্রাণীর গোশত খাইতে নিষেধ করিবে যাহা 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া জবাই করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীর পক্ষে ইহা জায়েজ নহে যে, সে কোন হানাফীকে 'নাবীজ' (যাহাতে নেশা নাই) পান করিতে বারণ করিবে। কারণ, এইগুলি ইজতিহাদী বিষয়।

ইহ্তিসাবের তৃতীয় রোকন

ইহ্তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের তৃতীয় রোকন হইল মুহতাসিব আলাইহি (যাহার উপর আদেশ-নিষেধ করা হয়)। মুহ্তাসিব আলাইহির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা শর্ত যেন নিষিদ্ধ কর্মটি তাহার জন্য গর্হিত হইতে পারে। অর্থাৎ তাহার মানুষ হওয়া শর্ত, কিন্তু মুকাল্লাফ হওয়া শর্ত নহে। মুকাল্লাফ বলা হয়, এমন ব্যক্তিকে যাহার উপর শরীয়তের বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইতে পারে। এই নীতিমালার আলোকেই ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি, কোন বালক শরাব পান করিলে তাহাকেও নিষেধ করা হইবে। অথচ এখনো সে বালেগ হয় নাই এবং নাবালেগ হওয়ার কারণে সে মুকাল্লাফ নহে।

অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তির উপর আদেশ-নিষেধ করা হইবে তাহার মধ্যে ভালমন্দ যাচাই করার শক্তি থাকাও শর্ত নহে। সেমতে কোন উন্মাদ ব্যক্তি যদি কোন উম্মাদ নারীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে নিষেধ করা হইবে। অথচ উন্মাদের মধ্যে ভালমন্দ যাচাই করার কোন যোগ্যতা নাই। অবশ্য কোন কোন কর্ম এমন আছে যাহা উন্মাদের জন্য যথার্থ গর্হিত নহে। যেমন, নামাজ-রোজা তরক করা ইত্যাদি।

প্রাণী হওয়ার শর্ত না লাগাইবার কারণ

উপরের আলোচনার আলোকে এখানে বলা যাইতে পারে যে, মুহতাসিব আলাইহি বা যাহার উপর আদেশ-নিষেধ করা হইবে সে "মানুষ হইতে হইবে" এমন শর্তের পরিবর্তে যদি বলা হইত, সে "প্রাণী হইতে হইবে" তবে ভাল হইত। কেননা, উহার ফলে কোন গরু-ছাগল কাহারো খেত নষ্ট করিতে লাগিলে আমরা উহাতে বাধা দিতে পারিতাম- যেমন উন্মাদ ব্যক্তিকে ব্যভিচার করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করা হয়। এই বক্তব্যের জবাবে আমরা বলিব- বস্তুতঃ কোন জীব-জানোয়ারকে বাধা দেওয়ার নাম "অন্যায়ের প্রতিরোধ" হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। কেননা, আল্লাহর হকের কারণে কোন গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়ার নামই হইল ইহ্তিসাব। এই ইহ্তিসাবের দাবী হইল, যাহাকে বাধা দেওয়া হইবে সে যেন সেই গর্হিত কর্ম হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। বিষয়টাকে ভালভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুন- হক্কুল্লাহর

কারণেই উন্মাদকে ব্যভিচার হইতে এবং বালককে শরাব পান করা হইতে নিষেধ করা হয়। কেননা, নীতিগতভাবে ব্যভিচার ও মদ্য পান হারাম, আর এখানে আল্লাহর সেই হুকুম লংঘিত হইতেছে। অর্থাৎ এখানে শুধুই আল্লাহর হক নষ্ট হইতেছে। কিন্তু কোন মানুষ যদি অপর কাহারো ফসল নষ্ট করে তবে এই ক্ষেত্রে বান্দার হক এবং আল্লাহর হক– এই উভয় প্রকার হকই নষ্ট করা হইবে। সংশ্লিষ্ট বান্দার হক হইল, সে ঐ ফসলের মালিক এবং তাহার মালিকানাধীন সম্পদ নষ্ট করা হইতেছে। আর আল্লাহর হক হইল, এখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া একটি পাপ করা হইতেছে। অর্থাৎ এখানে দুইটি হক এবং দুইটি ত্রুটি। একটি ত্রুটি অপরটি হইতে পৃথক। এই কারণেই কোন ব্যক্তি যদি কাহারো অনুমতি সাপেক্ষে তাহার হস্ত কর্তন করে, তবে এই ক্ষেত্রে হক্কুল্লাহ তথা আল্লাহর হুকুম অমান্য হওয়ার কারণে নিষেধ করা হইবে। কিন্তু হাতের মালিক যেহেতু উহা কর্তন করার অনুমতি দিয়াছে, সুতরাং এখানে তাহার হক বিলুপ্ত হইবে।

এইবার বিষয়টাকে আরো সহজভাবে উপলব্ধি করুন। জীব-জানোয়ার যদি কাহারো কিছু নষ্ট করে, তবে উহাতে কোন পাপ হইবে না। কিন্তু বর্ণিত দুইটি ত্রুটির একটি বিদ্যমান হওয়ার কারণে জীব-জানোয়ারকেও বাধা দেওয়া হইবে। বস্তুতঃ জীব-জানোয়ারকে শস্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার অর্থ সেই জানোয়ারকে নিষেধ করা নহে; বরং এখানে নেহী আনিল মুনকারের উদ্দেশ্য একজন মুসলমানের সম্পদ হেফাজত করা। যদি জানোয়ারকে নিষেধ করাই লক্ষ হইত তবে তো উহাকে মুরদার খাইতে দেখিলে কিংবা শরাবের পাত্রে মুখ দিতে দেখিলেও নিষেধ করা হইত। কেননা, এইসব কর্মও গর্হিত। অথচ শিকারী কুকুরকে মৃত প্রাণীর গোশত খাওয়ানো জায়েয।

মোটকথা, এখানে মূল লক্ষ্য হইতেছে মুসলমানের মালের হেফাজত করা। সুতরাং আমাদের পক্ষে যদি বিনা ক্লেশে অপর কাহারো সম্পদের হেফাজত সম্ভব হয়, তবে অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। মনে করুন, উপর হইতে কাহারো একটি মটকা পতিত হইতেছে এবং উহার বরাবর নীচে অপর কাহারো একটি বোতল রক্ষিত আছে। বোতলের উপর মটকা পতিত হইলে বোতলটি চূর্ণ হইয়া যাওয়া নিশ্চিত। এখন বোতলটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মটকার পতন বাধা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই বাধা প্রদানের উদ্দেশ্য বোতলের হেফাজত; মটকার পতন প্রতিরোধ নহে।

অনুরূপভাবে উন্মাদকে জানোয়ারের সঙ্গে ব্যভিচার করা এবং অপ্রাপ্ত বালককে শরাব পান করা হইতে বাধা দানের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য জানোয়ারকে রক্ষা করা কিংবা শরাবের হেফাজত নহে; বরং এই ক্ষেত্রে

আমাদের উদ্দেশ্য হইবে উন্মাদ ও বালকের হেফাজত। কেননা, এই উন্মাদ ও বালক হইল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ইনসান- যাহারা সম্মানের পাত্র। আসলে এইসব বিষয় এমনই জটিল ও সূক্ষ্ম যে, সকলের পক্ষে উহার মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন বটে। ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী ও মোহাক্কেক ব্যক্তিগণই কেবল এইসবের হাকীকত যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের পক্ষেও এইসব বিষয়ে গাফেল থাকা উচিৎ নহে।

মুসলমানের সম্পদের হেফাজত

সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকিলে মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করা কর্তব্য। এখন প্রশ্ন হইল, কোন মুসলমানের ক্ষেতে হয়ত কোন পশু ঢুকিয়া তাহার ফসল নষ্ট করিতেছে। এখন সেই পশুকে ক্ষেত হইতে তাড়াইয়া দেওয়া দর্শকের উপর ওয়াজিব কিনা? অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ নষ্ট হইতে দেখিলে দর্শকের যদি উহা রক্ষা করার ক্ষমতা থাকে, তবে সেই মুসলমান ভ্রাতার সম্পদ রক্ষা করা তাহার কর্তব্য কিনা? যদি বলা হয়, অবশ্যই তাহা রক্ষা করিতে হইবে; তবে তো মানুষকে জীবন ব্যাপী অপর মুসলমানের উপকারেই ব্যপৃত থাকিতে হইবে। কেননা, এইরূপ অবস্থা তো তাহাকে হরহামেশাই প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যদি বলা হয়- মুসলমানের সম্পদ হেফাজত করা ওয়াজিব নহে, তাহা হইলে আমরা বলিব, তবে তো সেই ব্যক্তিকেও নিষেধ না করা উচিৎ, যে অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করিতেছে। কেননা, অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করার মধ্যে যেমন মুসলমানের সম্পদের হেফাজত বিদ্যমান; তদ্রূপ লুণ্ঠনকারী লুণ্ঠনে বাঁধা দেওয়ার মধ্যেও তাহা বিদ্যমান। আসলে ইহা একটি জটিল প্রসঙ্গ বটে। এই বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল- কোন ব্যক্তি যদি নিজের শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও নিজের মান-সম্মান বজায় রাখিয়া অপরের সম্পদ হেফাজত করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে মুসলমান ভাইয়ের সম্পদের হেফাজত করা কর্তব্য। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের অসংখ্য হক রহিয়াছে। শারীরিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করা- সেইসব হকের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

মোটকথা, কোনরূপ ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি না হইলে এক মুসলমান অপর মুসলমানের সম্পদের হেফাজত করিবে। ইহা মুসলমানের হক এবং এই হক আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের দৃষ্টিতে এই ওয়াজিব ছালামের জবাব দানের ওয়াজিব অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ছালামের জবাব না দিলে এই পরিমাণ কষ্ট হয় না- যেই পরিমাণ কষ্ট হয় সম্পদের হেফাজত না করিলে। আলেমগণ এইরূপও বলিয়াছেন যে, কাহারো সম্পদ ছিনাইয়া লওয়ার পর কোন ব্যক্তির নিকট যদি ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে, যাহা

দ্বারা ঐ সম্পদ ফেরৎ পাওয়া যাইতে পারে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। না দিলে গোনাহগার হইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে সাক্ষ্য দেওয়া যেমন জরুরী, তদ্রূপ সম্পদের হেফাজত করাও জরুরী। তবে শর্ত হইল, সাক্ষ্যদাতা ও সম্পদের হেফাজতকারীর যেন কোনরূপ আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ অপরের জন্য সাক্ষ্য প্রদান বা অপরের সম্পদের হেফাজত করিতে গিয়া যদি নিজের জান-মাল বা সম্মানের ক্ষতিসাধনের আশংকা দেখা দেয় তবে এইরূপ ক্ষেত্রে সেই ওয়াজিব রহিত হইয়া যায়। কেননা, অপরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জরুরী, তদ্রূপ নিজের জান-মালের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণও জরুরী। অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বলা হয় নাই। অবশ্য নিজের স্বার্থের উপর অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া যাইবে। অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া মোস্তাহাব। আর মুসলমানের জন্য কষ্ট বরদাশত করা এবাদত। সুতরাং কোন পশুকে খেত হইতে বাহির করা যদিকষ্ট কর হয়, তবে এই ক্ষেত্রে উহাকে ক্ষেত হইতে বাহির করার জন্য চেষ্টা-তদ্বির করা জরুরী নহে। তবে খেতের মালিককে এই বিষয়ে অবগত করা যদি সম্ভব হয়, তবে তাহাতে অবহেলা করা উচিৎ হইবে না। কেননা, ইহাতে কোনরূপ কষ্ট হওয়ার কথা নহে। অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খেতের মালিককে এই বিষয়ে অবহিত না করা এবং সে ঘুমাইয়া থাকিলে তাহাকে জাগ্রত না করা– কাজীর নিকট সাক্ষ্য প্রদান না করার সমান অপরাধ।

. উপরোক্ত প্রসঙ্গে এইরূপ বলা ঠিক হইবে না যে, "এই ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া একটি দিককে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। উদাহরণতঃ যেই ব্যক্তি খেত হইতে পশু তাড়াইবে, তাহার এক দেরহাম ক্ষতি হইবে, পক্ষান্তরে খেত হইতে পশু না তাড়াইলে খেতের মালিকের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হইবে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে পশু তাড়ানোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।"

উপরোক্ত প্রসঙ্গে আমরা বলিব, খেতের মালিকের যেমন হাজার হাজার দেরহামের ফসল রক্ষা করার হক আছে; তদ্রূপ সেই ব্যক্তিরও তাহার এক দেরহাম রক্ষা করার হক আছে। সুতরাং এই কথা বলিবার কোন সুযোগ নাই যে, যাহার ক্ষতির পরিমাণ বেশী, তাহার দিকটিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে।

পতিত বস্তু হেফাজত করা

পতিত বস্তু উদ্ধার ও হেফাজত করার বিষয়টি আমাদের বক্ষমান আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং এই বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি, তাহাও এখানে আলোচনা করা হইবে।

এমন পতিত বস্তু যাহা উদ্ধার না করিলে নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশংকা বিদ্যমান, আর তাহা উদ্ধার করিলে "মুসলমানের সম্পদ হেফাজত" হওয়া নিশ্চিত– এমতাবস্থায় সেই বস্তু উদ্ধার করিয়া হেফাজত করা কিনা? এই প্রশ্নের জবাবে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হইল– বস্তুটি যদি এমন জায়গায় পড়িয়া থাকে যে, তথা হইতে উহা উদ্ধার না করিলে বিনষ্ট হওয়া বা মালিকের নিকট না পৌঁছাইবার আশংকা নাই; তবে এই ক্ষেত্রে তাহা উদ্ধার করা জরুরী নহে। যেমন, বস্তুটি হয়ত কোন মসজিদ বা মুসাফির খানায় পড়িয়া আছে এবং তথাকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঈমানদার ও বিশ্বস্ত।

অবশ্য পতিত বস্তুটি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকিলে সেই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, উহা উদ্ধার ও হেফাজত করিতে কোনরূপ কষ্ট ও পেরেশানী হইবে কিনা? যদি কষ্টকর হয়, যেমন পতিত বস্তুটি হয়ত কোন প্রাণী যাহা উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া নেহায়েতই কষ্টকর এবং উদ্ধার-পরবর্তী উহার দানাপানির আয়োজন ও রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি আরো কষ্টকর। এইরূপ ক্ষেত্রেও উহা উদ্ধার ও হেফাজত করা জরুরী নহে। কেননা, পতিত বস্তুটির মালিকের হকের কারণেই উহা উদ্ধার করা জরুরী হয়। তাহার হকের প্রতি এই কারণে লক্ষ্য করা হয় যে, সে একজন ইনসান এবং ইনসান হইল সম্মানের পাত্র। কিন্তু এই ইনসান হওয়ার বৈশিষ্ট্য এককভাবে কেবল মালিকের জন্যই সংরক্ষিত নহে। বরং উদ্ধারকারী ব্যক্তিও এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুতরাং মালিকের যেমন এই হক আছে যে, তাহার সম্পদ যেন হেফাজত করা হয়, তদ্রূপ উদ্ধারকারীরও এই হক আছে যে, অপরের সম্পদ হেফাজত করিতে গিয়া যেন তাহাকে কষ্টের শিকার হইতে না হয়।

এমন পতিত বস্তু যাহা উদ্ধার করিলে উহার হেফাজত এবং মালিকের জন্য এক বৎসর অপেক্ষা এবং উহার জন্য এলান করা ব্যতীত অন্য কোন কষ্ট নাই– তাহা কুড়াইয়া আনা যাইবে কিনা, এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। যেমন পতিত বস্তুটি হয়ত মুদ্রা, স্বর্ণ বা মূল্যবান কাপড়। অর্থাৎ এই সব বস্তু হেফাজতের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট করিতে হয় না। কেহ কেহ বলেন, দীর্ঘ এক বৎসর পতিত বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে এলান করা এবং যথা বিহিত এই আমানতের হেফাজত ইত্যাদিও কম কষ্টকর নহে। সুতরাং এই ক্ষেত্রেও পতিত বস্তুটি উদ্ধার করা আবশ্যক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য কেহ যদি এইসব ঝামেলা বরদাশত করিতে পারে এবং ছাওয়াবের নিয়তে তাহা কুড়াইয়া আনে, তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হকের কথা চিন্তা করিলে এই কষ্ট কোন কষ্টই নহে।

ইহা যেন কাজীর আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দেওয়ার কষ্ট স্বীকার করার মতই

একটি মামুলী কষ্ট। অবশ্য কাজীর আদালত যদি অন্য কোন শহরে হয়, তবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সফরের কষ্ট স্বীকার করা জরুরী নহে। তবে কেহ যদি অপরের উপকারার্থে স্বেচ্ছায় এই কষ্ট স্বীকার করে তবে তাহা ভিন্ন কথা। আর কাজীর আদালত যদি নিকটেই হয়, তবে এই ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানে অবহেলা করা উচিত নহে।

কিন্তু এখানে একটি তৃতীয় অবস্থা হইল, কাজীর আদালত যদি শহরের অপর প্রান্তে অবস্থিত হয় এবং দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় তথায় গমন করা যদি কষ্টকর হয়, তবে এই ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ? বস্তুতঃ এই বিষয়ে নিজের ইজতিহাদ ও গভীর বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, মুসলমানের হক আদায়ের ক্ষেত্রে যেই কষ্ট হয়, তাহা ক্ষেত্র বিশেষ কম হয় আবার বেশীও হয়। এই দুই অবস্থার হুকুম কি তাহা পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মধ্যম অবস্থাটি অত্যন্ত নাজুক ও সংশয়পূর্ণ। ইহা এমন এক জটিল সমস্যা যে, মানুষের পক্ষে ইহার সমাধান দুরূহ বটে। কেননা, এই ক্ষেত্রে আমরা এমন কোন পদ্ধতি ও বিধানের সন্ধান পাই নাই যাহা দ্বারা এই মধ্যম পদ্ধতিটির সঠিক অবস্থান নিরূপনপূর্বক উহাকে কম কষ্টের বা বেশী কষ্টের দিকে যুক্ত করা যাইবে। এই কারণেই আহলে তাকওয়া ও পরহেজগার ব্যক্তিগণ এই জাতীয় নাজুক অবস্থায় নিজেদের ব্যাপারে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং কোনরূপ সংশয় ও সন্দেহজনক অবস্থায় সংশ্লিষ্ট না হইয়া বরং নিশ্চিত অবস্থার উপর আমল করেন।

চতুর্থ রোকন ঃ ইহ্তিসাব

ইহ্তিসাব তথা "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" কয়েকটি স্তরে বিভক্ত এবং উহার কতক আদব রহিয়াছে। নিম্নে আমরা ইহ্তিসাবের স্তর এবং উহার আদবসমূহের উপর পৃথক শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইহ্তিসাবের প্রথম স্তরঃ তা'রীফ

ইহ্তিসাবের প্রথম স্তর হইল তা'রীফ। অর্থাৎ গর্হিত কর্ম খুঁজিয়া বেড়ানো এবং এমন আলামত ও লক্ষণ অনুসন্ধান করা যেন উহা দ্বারা মুনকার তথা গর্হিত কর্মটি প্রমাণ করা যায়। বস্তুতঃ ইহা গুপ্তচরবৃত্তি এবং শরীয়তে ইহা নিষিদ্ধ। সুতরাং কোন মুসলমানের পক্ষে শোভনীয় নহে–

০ কাহারো ঘরের দেয়ালে কান পাতিয়া ভিতরের বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনিতে চেষ্টা করা।

০ পথ চলার সময় জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করা এবং কোন ঘর হইতে শরাবের গন্ধ আসিতেছে কি না তাহা মালুম করার চেষ্টা করা।

০ কাহারো জামার নীচে বা আস্তিনের ভিতর রক্ষিত দ্রব্যের উপর হাত রাখিয়া জানিতে চেষ্টা করা যে, ইহা কোন অবৈধ দ্রব্য বা শরাবের বোতল কি-না।

০ মানুষের চরিত্র ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাহার প্রতিবেশীর নিকট জিজ্ঞাসা করা– ইত্যাদি।

অবশ্য দুইজন সত্যবাদী ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত নিজেরাই আসিয়া বলে যে, অমুক ব্যক্তির ঘরে শরাব আছে এবং সে উহা পান করিতেছে, তবে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বিনা অনুমতিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া উহাতে বাধা দেওয়া যাইবে। অন্যায় কর্মে বাধা দানের উদ্দেশ্যে গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করা যেন অন্যায় কর্মের জন্য কাহাকেও প্রহার করার মত।

সংবাদদাতা যদি একজন সত্যবাদী ও দুইজন গোলাম হয় কিংবা এমন কতক লোক হয় যাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না, তবে তাহাদের সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া কাহারো ঘরে প্রবেশ করা ঠিক হইবে না। কেননা, গৃহকর্তার এই হক স্বীকৃত যে, তাহার অনুমতি ছাড়া যেন কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ না করে। আর কোন মুসলমানের হক প্রমাণিত হওয়ার পর যতক্ষণ না দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, ততক্ষণ তাহার এই হক বলবৎ থাকিবে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ গর্হিত কর্মটি জানাইয়া দেওয়া

অনেক সময় অজ্ঞতার কারণেও অন্যায় ও গর্হিত কাজ করা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইহা জানা নাই যে, সে যাহা করিতেছে শরীয়তে তাহা নিষিদ্ধ। যদি জানা থাকিত, তবে কস্মিনকালেও সে এইরূপ করিত না। যেমন অনেক গ্রাম্য লোক নিয়মিত নামাজ পড়ে বটে কিন্তু অজ্ঞতার কারণেই তাহারা রুকু-সেজদাগুলি ঠিকমত আদায় করে না। অবশ্য এই শ্রেণীটি সম্পর্কে এইরূপ বলা যাইবে না যে, তাহারা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান নহে। কেননা, যদি এইরূপই হইত তবে তো উহার জন্য তাহারা অজু, তাহারাত ইত্যাদির কষ্ট স্বীকার করিয়া জামাতে আসিয়া হাজির হইত না। আসলে এই গ্রাম্য লোকেরা একেবারেই সাধাসিধা ও সরল। দ্বীনের এলেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই তাহারা সঠিক মাসআলার উপর আমল করিতে পারিতেছে না। এই শ্রেণীর মানুষকে নরম ভাষায় শরীয়তের বিধান জানাইয়া দিতে হইবে। নরম ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে এই কারণে যে, কাহাকেও কোন মাসআলা বলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল, প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে তাহাকে অজ্ঞ ও মূর্খ প্রমাণিত করা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে অপমানবোধ করা খুবই

স্বাভাবিক। কেননা, এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাইবে, যে নিজের প্রতি মূর্খতার অভিযোগ স্বাভাবিকভাবে মানিয়া লইবে। বিশেষতঃ ধর্মীয় বিষয়ে মূর্খতার অভিযোগ উঠিলে মানুষের নিকট তাহা নেহায়েতই অসহনীয় মনে হয়। এই কারণেই কোন মানুষকে যখন শরীয়তের বিধান অবহিত করিয়া গর্হিত পন্থা পরিহার পূর্বক সঠিক মাসআলার উপর আমল করিতে বলা হয়, তখন সে উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং জানিয়া শুনিয়াই হক ও সত্য বিষয় অস্বীকার করিয়া বসে, যেন তাহার মূর্খতা সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া না পড়ে। স্বভাবগতভাবে মানুষ যেন নিজের সতর ঢাকা অপেক্ষা মূর্খতার আয়েব (ত্রুটি) ঢাকিয়া রাখিতে অধিক তৎপর হয়। কারণ মূর্খতা হইল নফসের ত্রুটি আর সতর খোলা থাকা দেহের ত্রুটি। এ দিকে নফস দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই কারণে নফসের ত্রুটিও অধিক যঘন্য। এতদ্ব্যতীত দেহের ত্রুটির কারণে দেহের উপর কোন তিরস্কার করা হয় না। কারণ, দেহ হইল আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ ইচ্ছা করিলে না উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারে, না উহাকে ত্রুটিযুক্ত করিতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ ইচ্ছা করিলেই মূর্খতার অভিশাপ দূর করিয়া নিজের নফসকে এলেমের অলংকার দ্বারা সজ্জিত করিতে পারে। এই কারণেই মানুষকে তাহার মূর্খতার কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে কষ্ট অনুভব করে। পক্ষান্তরে তাহার এলেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে পুলকিত হয় এবং অপরের উপর তাহার এলেমের তাছীর অনুভব করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

সারকথা হইল, কোন মানুষকে তাহার মূর্খতা সম্পর্কে জ্ঞাত করা যেহেতু তাহার জন্য কষ্টের কারণ হয়, এই কারণে মুহতাসিব তথা আদেশ-নিষেধকারীর কর্তব্য, বিনয় ও বিনম্র আচরণের মাধ্যমে তাহাদের মূর্খতা দূর করার চেষ্টা করা। যেমন গ্রামের মূর্খ লোকদিগকে এইভাবে বলা যাইতে পারেঃ দেখুন, কোন মানুষই মায়ের উদর হইতে লেখাপড়া শিখিয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমি নিজেও ইতিপূর্বে নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। পরে আলেমদের নিকট হইতে তাহা শিখিয়া লইয়াছি। সম্ভবতঃ আপনাদের গ্রামে কোন আলেম নাই, কিংবা থাকিলেও তিনি হয়ত আপনাকে সঠিক মাসআলা বলিয়া দিতে পারেন নাই। আর এই কারণেই হয়ত আপনি রুকু-সেজদায় ত্রুটি করিতেছেন। অথচ নামাজের শর্ত হইল, রুকু-সেজদাগুলি ঠিক ঠিক মত আদায় করিতে হইবে।

মোটকথা, এই ক্ষেত্রে কোনরূপ কঠোরতা আরোপ না করিয়া নম্রতার সহিত তাহাকে বুঝাইতে হইবে। বিনম্র আচরণ এই কারণেও জরুরী যে, কোন মুসলমানের নিকট তাহার কোন অন্যায় বার বার উল্লেখ করা এবং এই বিষয়ে তাহাকে বিব্রত করা যেমন হারাম, তদ্রূপ তাহাকে কষ্ট দেওয়াও হারাম। কোন

আকলমন্দ ও বুদ্ধিমানের পক্ষ হইতে এমন আশা করা যায় না যে, তিনি রক্তকে রক্ত দ্বারা কিংবা পেশাব দ্বারা পরিষ্কার করিতে চাহিবেন। তদ্রূপ, কোন গর্হিত কর্ম দেখিয়া নীরবতা অবলম্বনের অপরাধ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিনা প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর কঠোরতা আরোপ করাও যেন রক্তকে রক্ত দ্বারা ধৌত করারই নামান্তর। অথচ রক্তের নাপাকি রক্ত দ্বারা দূর হয় না। বরং পানি দ্বারাই উহাকে ধৌত করিতে হয়।

কোন ব্যক্তি যদি পার্থিব বিষয়ে কোন অপরাধ করে এবং তুমি তাহা জানিতে পার, তবে এই বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, তুমি তাহাকে ভুল ধরাইয়া দেওয়ার ফলে সে হয়ত অপমানবোধ করিবে এবং এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সে হয়ত তোমার শত্রুতে পরিণত হইবে। অবশ্য তুমি যদি ইহা জানিতে পার যে, ভুল ধরাইয়া দিলে সে তোমার উপর বিরক্ত না হইয়া বরং খুশীই হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে ভুল ধরাইয়া দেওয়া উত্তম। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হইল, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যাহারা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিয়া সতর্ককারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

তৃতীয় স্তর ঃ ওয়াজ-নসীহত

ইহ্‌তিসাবের তৃতীয় স্তর হইল, ওয়াজ-নসীহত ও আল্লাহর আজাবের ভয় দেখাইয়া মানুষকে পাপাচার হইতে নিষেধ করা। এই স্তরটি সেইসব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, যাহারা অন্যায়কে অন্যায় মনে করিয়া করে। যেমন কোন ব্যক্তি হয়ত মদপান, মানুষের উপর জুলুম-নির্যাতন ও মুসলমানের গীবত করায় অভ্যস্ত; অথচ এই ব্যক্তি ইহা ভালভাবেই জানে যে, শরীয়ত এই তিনটি বিষয়কে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদিগকে প্রথমতঃ ওয়াজ-নসীহত এবং আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করা এবং হাদীসে পাকের এমন সব বিবরণ শোনানো উচিৎ যাহাতে এইসব কাজের শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বুজুর্গানে দ্বীনের উন্নত চরিত্র ও তাহাদের ঘটনাবলী শোনানো হিতকর। ফলে উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যেও আমলের জযবা পয়দা হইবে।

ওয়াজ-নসীহতের এই আমলটি অতীব বিনয় ও নম্রতার সহিত করিতে হইবে। কেননা, কোনরূপ কঠোরতা এই ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হইতে পারে। অপরাধীকে হেকারত ও তুচ্ছ নজরে না দেখিয়া বরং মোহাব্বতের নজরে দেখিতে হইবে এবং তাহার অপরাধকে নিজেরই অপরাধ মনে করিতে হইবে। কেননা, সকল মুসলমানই এক দেহ ও এক প্রাণ।

এখানে একটি ভয়াবহ বিপদের বিষয় হইল, এক শ্রেণীর আলেম ও কতক

ওয়ায়েজ মানুষকে তাহাদের অজ্ঞতা ও অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করার সময় নিজের এলেমের মাহাত্ম্য এবং সেই ব্যক্তির অজ্ঞতা ও মূর্খতার কথা স্মরণে আনিয়া পুলক অনুভব করিয়া থাকে। অনেকে তো কেবল এই উদ্দেশ্যেই ওয়াজ-নসীহত করিয়া বেড়ায় যে, উহার ফলে সকলের নিকট তাহার এলেম ও বিদ্যা-বুদ্ধির কথা প্রকাশ পাইবে এবং সেই সঙ্গে মানুষের অজ্ঞতা ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। তো ওয়াজ-নসীহতের উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করিয়া নিজের বড়ত্ব ও এলেমের গরিমা প্রকাশ করা, তবে এই ওয়াজের মাধ্যমে যেই অনিষ্ট দূর করার চেষ্টা করা হইবে; এই ওয়াজ নিজেই তদাপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টের কারণ হইবে। এই ধরনের ইহ্তিসাবের উদাহরণ যেন নিজেকে জ্বালাইয়া অপরকে আগুন হইতে রক্ষার চেষ্টা করার মত। ইহা চরম মূর্খতা, অন্তহীন গোমরাহী এবং শয়তানের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। আল্লাহ্ পাক যাহাকে হেদায়েতের নূর দান করিয়াছেন কেবল সেই ব্যক্তিই শয়তানের এইরূপ ফেরেব হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

অপরের উপর হুকুম চালাইয়া মানুষের আত্মা দুইটি কারণে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ এলেমের গৌরব, দ্বিতীয়তঃ অপরের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার অহংকার। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ লোকদেখানো রিয়া ও সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা মানুষের অন্তরের এক গোপন বাসনা এবং উহার ফলে মানুষ গোপন শিরকে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তরের এই গোপন ব্যাধি উপলব্ধি করা বড় কঠিন। এখানে আমরা এই ব্যাধি নির্ণয়ের একটি মানদণ্ড উল্লেখ করিব। এই মানদণ্ডের আলোকেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি নিজের অবস্থা যাচাই করিয়া দেখিতে পারিবে যে, সে এই রোগে আক্রান্ত কি-না। অর্থাৎ সে গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবে– সে কি এইরূপ কামনা করে যে, তাহার নিজের মাধ্যমেই অপরের সংশোধন হউক, না এইরূপ কামনা করে যে, এই নেক কাজে অপর কোন ব্যক্তি অগ্রসর হউক, কিংবা গর্হিত কর্মটি যেন নিজে নিজেই দূর হইয়া যায় এবং ইহ্তিসাব তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কোন প্রয়োজনই না হয়।

অর্থাৎ, ইহ্তিসাবের আমলটি যদি নিজের জন্য কষ্টকর ও বিব্রতকর মনে হয় এবং সে এইরূপ কামনা করে যে, অপর কাহারো মাধ্যমেই যেন অন্যায়ের প্রতিরোধের কাজটি সমাধা হয়, তবে তাহার উচিৎ ইহ্তিসাবের উপর আমল করা। কেননা, এই ক্ষেত্রে তাহার এই আমলটি হইবে সত্যিকার অর্থেই দ্বীনের স্বার্থে। পক্ষান্তরে তাহার অন্তরে যদি এই বাসনা সুপ্ত থাকে যে, অপরাধীকে তাহার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করিয়া তাহা দূর করার দায়িত্ব আমিই পালন করিব এবং আমার উদ্যোগেই এই অন্যায় দূর হইবে, তবে তাহার পক্ষে এই

উদ্যোগ তরক করা উত্তম। কেননা, এই ক্ষেত্রে সে নেহী আনিল মুনকারের আমলকে নিজের জন্য ইজ্জত ও সুখ্যাতির অর্জনের বাহন বানাইতে চাহিতেছে। তাহার উচিৎ আল্লাহকে ভয় করা এবং নিজের নফসের এছলাহের ফিকির করা। এমন যেন না হয় যে, অপরকে সংশোধন করিতে গিয়া সে নিজেই বরবাদীর শিকার হইয়া পড়ে। পবিত্র কোরআনে প্রথমে নিজের নফসকে নসীহত করিতে বলা হইয়াছে এবং নিজের নফস নসীহত কবুল করিবার পরই অপরকে নসীহতের কথা উল্লেখ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি হযরত দাউদ তাঈ'র খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, এক ব্যক্তি আমীর ও শাসকবর্গের নিকট গিয়া সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, তাহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? জবাবে তিনি বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছে, সেই ব্যক্তিকে চাবুক লাগানো হয় কি-না? লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি এই সবের কোন পরওয়া করে না। হযরত দাউদ তাঈ বলিলেন, তবে আমার আশংকা হইতেছে, সেই ব্যক্তির গর্দানে হয়ত তলোয়ার রাখা হইবে। লোকটি আবারও আরজ করিল, সেই ব্যক্তি এইসবেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। এই বার হযরত দাউদ তাঈ এরশাদ করিলেন, আমার ভয় হইতেছে, সেই ব্যক্তির অন্তরে গোপন ব্যাধি অর্থাৎ অহংকার ও তাকাব্বুরী পয়দা হয় কি-না।

চতুর্থ স্তরঃ তিরস্কার ও কঠোরতা

ইহ্তিসাবের চতুর্থ স্তর হইল, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া অন্যায় কাজ হইতে বারণ করা। অর্থাৎ নরম ভাষায় নসীহত করিবার পরও যদি লোকেরা অন্যায়ের উপর জমিয়া থাকে এবং ওয়াজ-নসীহতের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করে, তবে এই ক্ষেত্রে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ওয়াজ-নসীহত ও নরম ভাষার সকল স্তর অতিক্রম করিবার পর নিজের কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন–

أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থঃ "ধিক তোমাদের জন্য এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদেরই এবাদত কর, তাহাদের জন্য। তোমরা কি বোঝ না?" (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৬৮)

কঠোর ভাষা ব্যবহারের অর্থ ইহা নহে যে, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। বরং অপরাধীর প্রতি এমন ভাষা প্রয়োগ করিবে যাহা অশ্লীলতার মধ্যে গণ্য নহে। যেমন হে নির্বোধ, হে পাপিষ্ঠ! তোমার কি আল্লাহর ভয় নাই– ইত্যাদি।

বস্তুতঃ যেই ব্যক্তির বিবেক নাই, সে নির্বোধ বটে। বিবেক থাকিলে নিশ্চয়ই

সে আল্লাহর নাফরমানী করিত না। বুদ্ধিমান ও নির্বোধ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله .

অর্থঃ "সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান যার নফস অনুগত এবং যে পারলৌকিক জীবনের জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যার নফস খাহেশাতের আনুগত্য করে এবং আল্লাহর নিকট মিথ্যা বাসনা করে।" (তিরমিজী, ইবনে মাজা)

উপরে বর্ণিত স্তরের উপর আমল করার দুইটি স্তর রহিয়াছে–

প্রথমতঃ যখন দেখিবে যে, নরম ভাষার ব্যবহার ও সাধারণ নসীহতে কোন কাজ হইতেছে না, তখন কঠোর ভাষা ব্যবহার করিবে।

দ্বিতীয়তঃ একটি বর্ণও মিথ্যা বলিবে না। এমন নহে যে, নিজের মুখকে বে-লাগাম ছাড়িয়া দিবে এবং মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া বকাঝকা করিতে থাকিবে। মোটকথা, যাহা বলিবে তাহা সত্য বলিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলিবে না।

কঠোর ভাষা ব্যবহারের পরও যদি এইরূপ মনে হয় যে, লোকটি সেই গর্হিত কর্ম ত্যাগ করিবে না, তবে এমতাবস্থায় নীরব থাকাই উত্তম। তবে নিজের আচার-আচরণ দ্বারা অবশ্যই অসন্তোষ প্রকাশ করিবে এবং অন্তর দ্বারাও তাহার পাপকে ঘৃণা করিবে। অর্থাৎ এই পাপের কারণেই সেই ব্যক্তিকে কেবল হীন মনে করিবে– উহার অতিরিক্ত কিছু নহে। তাছাড়া যদি এইরূপ একীন হয় যে, নসীহত করিলে আমাকে দৈহিকভাবে কষ্ট দেওয়া হইবে, আর অসন্তোষ প্রকাশ করিলে দৈহিক নির্যাতন হইতে নিরাপদ থাকা যাইবে, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নসীহত করা জরুরী নহে বটে কিন্তু অন্তর দ্বারা খারাপ জানা এবং নিজের আমল দ্বারা তাহা প্রকাশ করা জরুরী হইবে।

পঞ্চম স্তরঃ হাত দ্বারা বাধা দেওয়া

যদি সম্ভব হয় তবে অসৎ কাজে হাত দ্বারা বাধা দিবে। যেমন– গানবাজনার সরঞ্জাম ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, শরাব ফেলিয়া দিবে, রেশমের পোশাক খুলিয়া ফেলিবে, রেশমের বিছানায় বসিতে দিবে না, নাপাক অবস্থায় মসজিদে ঢুকিতে দিবে না এবং ঢুকিয়া থাকিলে বাহির করিয়া দিবে– ইত্যাদি। তবে এমন কিছু কাজ আছে যাহা হাত দ্বারা বাঁধা দেওয়া যায় না। যেমন মুখ ও অন্তরের পাপ। অর্থাৎ, ইহা হাত দ্বারা দূর করিবার কোন উপায় নাই।

এই স্তরের উপর আমল করিবারও দুইটি স্তর রহিয়াছে। প্রথমতঃ হাত দ্বারা

বাধা দেওয়ার কাজটি তখন করিবে, যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সেই অন্যায় কর্ম ত্যাগ না করিবে। যদি ওয়াজ-নসীহত ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ দ্বারা কার্যোদ্ধার হয়, তবে হাত ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নাই। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি হয়ত জবর দখলকৃত বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে বা নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসিয়া আছে। এমতাবস্থায় কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিলে যদি সেই ব্যক্তি বাড়ীর দখল ছাড়িয়া দেয় বা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসে, তবে ধাক্কা দেওয়া বা টানাহেঁচড়া করা জায়েজ নহে। শরাব ফেলিয়া দেওয়া, বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা বা রেশমের পোশাক খুলিয়া ফেলার ক্ষেত্রেও এই একই নীতি অনুসরণ করিবে।

দ্বিতীয় আদব হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কেবল যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করিবে- উহার অতিরিক্ত নহে। যেমন জবর দখলকৃত বাড়ীতে অবস্থানকারী ব্যক্তি বা নাপাক অবস্থায় মসজিদে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে যদি হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তাহাকে টানা হেঁচড়া করা, ধাক্কা দেওয়া, দাড়ী ধরিয়া টানা বা চেঙদোলা করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা- ইত্যাদি জায়েজ নহে। কেননা, এখানে হাত ধরিয়া বাহির করার মধ্যেও উদ্দেশ্য পূরণ হইতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। অনুরূপভাবে রেশমের পোশাক একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলিবে না, বরং এমনভাবে উহার সেলাই খুলিয়া ফেলিবে যেন উহা ব্যবহারের উপযোগী না থাকে। অবৈধ খেলতামাশার উপকরণ ও বাদ্যযন্ত্র আগুনে না ফেলিয়া বরং এই পরিমাণ নষ্ট করিয়া দিবে যেন যেই কাজের জন্য উহা তৈরী করা হইয়াছে সেই কাজে ব্যবহার করা না যায়।

কোন দ্রব্য নষ্ট করার সীমা

কোন অবৈধ দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলারও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ উহাকে এই পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া দিবে যেন পুনরায় উহা মেরামত করিতে হইলে প্রথমবার উহা বানাইতে যেই পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় হইয়াছে, মেরামতের ক্ষেত্রেও সেই পরিমাণ অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হইবে। শরাবের পাত্র না ভাঙ্গিয়া যদি উহা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা ভাঙ্গিবে না। অবশ্য পাত্র না ভাঙ্গিয়া উহা ফেলিয়া দেওয়ার যদি কোন সুযোগ না থাকে, তবে নিরুপায় হইয়া উহা ভাঙ্গিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বাঁধা দানকারীর উপর ঐ পাত্রের ক্ষতিপূরণও আবশ্যক হইবে না। অর্থাৎ শরাবের কারণেই উহার মূল্য বাতিল হইয়া যাইবে। কেননা, শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এই পাত্র প্রতিবন্ধক ছিল এবং উহা ভাঙ্গা ব্যতীত শরাব ফেলিয়া দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। এমনকি শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি অপরাধীর দেহ প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহার দেহও যখম করা যাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের দেহ যে কোন পাত্র অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু শরাব ফেলিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়ার কারণে যদি উহাকে যখম করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তো শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলার বৈধতা আরো উত্তমভাবেই স্বীকৃত হইবে।

অনিষ্ট দমন, শাস্তি ও প্রতিরোধ

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, শরাবের পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলা, জবর দখলকৃত বাড়ী হইতে দখলকারীকে টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া– অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং উহার শাস্তি হিসাবে জায়েজ হওয়া উচিত ছিল। এই বক্তব্যের জবাব হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধ বা ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। শাস্তি প্রদান করা হয় কোন অতীত কর্মের পরিণাম হিসাবে। আর দমন করার বিষয়টি উপস্থিত অনিষ্টের সহিত সম্পৃক্ত। তো সাধারণ মানুষের পক্ষে কেবল এই শেষোক্ত দমন ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ উপস্থিত কোন অন্যায়কর্ম দেখিলে উহা দমন করিবে। এতদ্ব্যতীত আর যাহাকিছু করা হইবে হয় তাহা কোন অপরাধের শাস্তি বা ভবিষ্যৎ কর্মের প্রতিরোধ ও ভীতিপ্রদর্শন রূপেই গণ্য হইবে। অথচ শাস্তি প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন কেবল শাসনকর্তার এখতিয়ারভুক্ত। সাধারণ মানুষ না অতীত অপরাধের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিতে পারিবে, আর না ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য কোন অপরাধের বরাবরে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ স্তর ঃ ধমক ও ভীতি প্রদর্শন

ইহ্‌তিসাবের ষষ্ঠ স্তর হইল, ধমক দেওয়া ও ভীতি প্রদর্শন করা। যেমন অপরাধীকে এইরূপ বলা যে, তুমি যদি এইরূপ কর, তবে তোমার মাথা ফাটাইয়া ফেলিবে। কিংবা তোমাকে শায়েস্তা করিব বা শায়েস্তা করার হুকুম দেওয়া হইবে– অর্থাৎ সতর্কীকরণের এইজাতীয় কোন শব্দ ব্যবহার করা। তবে শর্ত হইল, যাহা বলা হইবে তাহা করার সামর্থ্য থাকিতে হইবে। এই স্তরটির আদব হইল, কখনো এমন সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবে না যাহা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নাই। যেমন, কখনো এইরূপ বলিবে না যে, তোমার বাড়ী-ঘর দখল করিয়া লইব, তোমার ছেলেকে মারিয়া ফেলিব কিংবা তোমার স্ত্রীকে আটক করিয়া রাখিব– ইত্যাদি।

এইরূপ সতর্কীকরণ ও সাবধানবাণী যদি বাস্তবায়নের নিয়তে করা হয়, তবে তাহা হারাম। আর বাস্তবায়ন না করার নিয়তে করা হইলে তাহা হইবে মিথ্যা। অবশ্য অপরাধী যদি এই ধরনের ধমকে প্রভাবিত না হয়, তবে নিষেধকারীর পক্ষে এই পর্যন্ত বলার অনুমতি আছে যাহা অপরাধীর অবস্থার সহিত

সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাবধানকারী কথা বলার সময় তাহার অন্তরের নিয়তের বরাবরে মুখে যদি কিছুটা বাড়াবাড়িও করে তবে তাহাও জায়েজ। তবে শর্ত হইল, তাহার এই একীন থাকিতে হইবে যে, এই বাড়াবাড়ি দ্বারা অপরাধী প্রভাবিত হইয়া স্বীয় অপরাধ হইতে ফিরিয়া আসিবে। এই ধরনের বাড়াবাড়ি মিথ্যার মধ্যে গণ্য নহে। বরং ইহাকে বলা হয়, অতিরঞ্জন। বস্তুতঃ এই জাতীয় ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের অতিরঞ্জন এই কারণে জায়েজ যে, ইহার মূল লক্ষ্য হইতেছে অপরাধীর সংশোধন। যেমন দুইজন শত্রুর মধ্যে সন্ধি স্থাপন ও বিবদমান দুই সতীনের মনোমালিন্য দূর করার ক্ষেত্রেও এইরূপ অতিরঞ্জন জায়েজ।

সপ্তম স্তর ঃ প্রহার করা

ইহ্তিসাবের সপ্তম স্তর হইল, প্রহার করা। প্রয়োজনে সাধারণ মানুষও এই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রেও কেবল যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণই করিবে– উহার অতিরিক্ত নহে। আর অপরাধ দমন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা গুটাইয়া লইবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর আর প্রহার করা জায়েজ নহে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ–

জনৈক কাজী এক ব্যক্তিকে কাহারো কোন হক নষ্ট করার অপরাধে বন্দী করিয়া রাখিল, কিন্তু বন্দী করিবার পরও যদি লোকটি সেই হক আদায় করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের অবস্থানে অটল থাকে, আর কাজী নিশ্চিতভাবে ইহা জানিতে পারে যে, লোকটি সেই হক আদায় করিতে সক্ষম বটে কিন্তু নিছক আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও গোয়ার্তুমির কারণেই সেই হক আদায় করিতে সে অস্বীকার করিতেছে– তবে এই ক্ষেত্রে তিনি কয়েদীকে সেই হক আদায়ে স্বীকারুক্তি আদায় পর্যন্ত প্রয়োজন পরিমাণ শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন। তদ্রূপ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্যও এই একই হুকুম। অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পরিমাণ প্রহার করা যাইবে। যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন হয় এবং অন্যায় প্রতিরোধকারীর এই একীন হয় যে, অপরাধী অস্ত্র দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িবে কিংবা অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধ হইতে তওবা করিয়া লইবে, তবে সেই ক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণেরও অনুমতি আছে। তবে শর্ত হইল, কোনরূপ ফেৎনার আশংকা যেন না থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন পাপিষ্ঠ হয়ত কোন নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে বা কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। এখন এই পাপিষ্ঠ অপরাধী ও অন্যায় প্রতিরোধকারীর মধ্যখানে একটি খাল যাহা অতিক্রম করিয়া অপরাধীকে ধরা সম্ভব নহে। এমতাবস্থায় অন্যায়-প্রতিরোধকারী তাহার বন্দুক উঠাইয়া চিৎকার করিয়া অপরাধীকে সতর্ক করিতে পারিবে এবং এমন হুমকিও দিতে পারিবে যে,

তুমি যদি এখুনি মহিলাকে ত্যাগ-না কর বা বাজনা বন্ধ না কর, তবে আমি গুলি করিতে বাধ্য হইব। এই সাবধানবাণীর পরও যদি অপরাধী সতর্ক না হয় এবং পূর্বোক্ত অপরাধে বহাল থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে গুলি বর্ষণ করা জায়েজ। তবে গুলি করার ক্ষেত্রে সেই পূর্বোক্ত সতর্কতা আবশ্যক। অর্থাৎ এমন কোন অঙ্গে গুলি করা যাইবে না, যেখানে গুলি বিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। সুতরাং হাতে বা পায়ে গুলি করিবে। তীর বা তলোয়ার দ্বারা আঘাত করার ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম।

অষ্টম স্তরঃ অন্যায়ের প্রতিরোধে সাহায্য কামনা

ইহ্‌তিসাবের অষ্টম স্তর হইল, অন্যায়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য কামনা করা। অর্থাৎ এককভাবে নিজের পক্ষে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনবোধে এইরূপ কামনা করা যে, কিছু লোক জড়ো হইয়া যেন এই কাজে আমাকে সাহায্য করে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে এমন হওয়াও বিচিত্র নহে যে, অপরাধীও তাহার নিজস্ব লোকজনকে জড়ো করিয়া প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবে এবং পরিণতিতে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুনাখুনির মত অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

এইরূপ পরিস্থিতিতে শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে কি-না এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে অন্যায় প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া যাইবে না। কেননা, উহার ফলে দুই পক্ষে লড়াই বাঁধিয়া চরম হানাহানি ও ফেৎনা-ফাসাদ ছড়াইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই ক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নহে। এই বক্তব্যই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, ইতিপূর্বে ইহ্‌তিসাবের যেইসব স্তর বর্ণিত হইয়াছে, যেমন– ওয়াজ-নসীহত, তিরস্কার ও কঠোরতা, হাত দ্বারা বাঁধা প্রদান, ভীতিপ্রদর্শন, প্রহার, এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এখন সবশেষ যেই স্তরটির কথা আলোচনা করা হইতেছে, এই ক্ষেত্রে অবশ্য উভয় পক্ষই নিজ নিজ পক্ষের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় বটে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কঠিন কোন পরিণতিকেও ভ্রূক্ষেপ করা যাইবে না। নিজের পক্ষের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য আহবানের পিছনে সৎ কাজের আদেশদাতার লক্ষ্য থাকে– যেন আল্লাহ্ পাকের রেজামন্দি ও সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে অপরাধীগণকে পরাস্ত করার জন্য লোকেরা একত্রিত হইয়া জেহাদে অবতীর্ণ হয়। অন্যায় প্রতিরোধকারীর এই পদক্ষেপে ক্ষতিকর কোন

দিক নাই। মুজাহিদ্বীনদের পক্ষে যেমন নিজেরা একত্রিত হইয়া কুফরী ও শেরেকী নির্মূলের উদ্দেশ্যে কাফেরদের যে কোন দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জায়েজ, তদ্রূপ মুহ্‌তাসিব তথা অন্যায় প্রতিরোধকারীর পক্ষেও নিজেদের লোকজন জড়ো করিয়া ফেৎনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা জায়েজ। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। বর্ণিত অবস্থায় কাফেরদের হত্যা করিতে যেমন কোন আপত্তি নাই, তদ্রূপ যেই ফাসেক নিজের অপরাধে অটল থাকার উদ্দেশ্যে হক পন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে, তাহাকে হত্যা করিতেও কোন নিষেধ নাই। কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী মুসলমান যেমন শহীদ হইবে, তদ্রূপ অন্যায় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি হকের উপর থাকিয়া যদি মজলুম অবস্থায় মারা যায়, তবে সেও শহীদ হইবে।

উপরে ইহ্‌তিসাবের যেই স্তরটির কথা আলোচনা করা হইল, এইরূপ অবস্থা সচরাচর খুব কমই দৃষ্ট হয়। কিন্তু কখনো এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে কেয়াসের দাবী কি, তাহা জানা থাকা আবশ্যক। সুতরাং কেয়াসের এই ধারা বিলুপ্ত করার কোন প্রয়োজন নাই এবং যথাস্থানে তাহা বহাল রাখিতে হইবে। যাহাই হউক, সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হইল– যেই ব্যক্তি অন্যায় দমন করিতে সক্ষম, সে হাতের দ্বারা কিংবা অস্ত্র দ্বারা তাহা দমন করিবে। সম্ভব হইলে একা করিবে কিংবা নিজস্ব লোকদের সহযোগিতা লইয়া সম্মিলিতভাবে করিবে। অর্থাৎ যেইভাবে সম্ভব হয় সেইভাবেই করা জায়েজ।

মুহ্‌তাসিবের আদব

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে বলা হয় ইহ্‌তিসাব। আর যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে, তাহাকে বলা হয় 'মুহ্‌তাসিব'। মুহ্‌তাসিবের আদব কি তাহা ইতিপূর্বেই ইহ্‌তিসাবের স্তরসমূহের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা উহার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরার প্রয়াস পাইব।

যেই ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিবে, তাহার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। যথা– এলেম, পরহেজগারী ও সৎ চরিত্র। এলেম এই কারণে আবশ্যক যে, উহার ফলে কখন, কি পরিমাণ ও কোন্ পরিস্থিতিতে আদেশ-নিষেধ করিতে হইবে এবং উহার আসবাব ও প্রতিবন্ধক কি এই বিষয়ে যেন সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।

পরহেজগারী এই কারণে আবশ্যক যে, তাহার যাহা কিছু জানা আছে উহার বিপরীত কর্ম যেন না করে। অর্থাৎ অনেক জ্ঞানী লোককে দেখা যায়, তাহারা নিজেদের এলেম ও জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে না। বরং তাহারা যে

ইহ্‌তিসাবের ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা লংঘন করিতেছে, এই কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সতর্ক হয় না। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হয়ত নিজের কোন ব্যক্তি স্বার্থ যেমন নিজের এলেমের প্রচার, সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি কারণে আদেশ নিষেধ অব্যাহত রাখে। এখন তাহাদের মধ্যে যদি এলেমের পাশাপাশি পরহেজগারী বিদ্যমান থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা নিজেদের সীমালংঘন বিষয়ে অবগত হওয়ার পর এই আমল ত্যাগ করিত।

সুতরাং এমন ব্যক্তির পক্ষে আদেশ-নিষেধ করা উচিৎ, যার বয়ানে তাছীর হয় এবং মানুষ যার নসীহত কবুল করে। এই গুণটি পরহেজগার ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। যেই ব্যক্তি ফাসেক ও তাকওয়া-পরহেজগারী হইতে বঞ্চিত, তাহার মুখে নসীহত ও সদুপদেশ শুনিলে মানুষ হাসাহাসি করে। এমনকি এই ক্ষেত্রে বক্তার পক্ষ হইতে কোনরূপ জুলুমের আশংকা না থাকিলে তাহার সঙ্গে বেআদবীও করিয়া বসে।

মুহ্‌তাসিবের জন্য সচ্চরিত্রতা আবশ্যক হওয়ার কারণ হইল, অনেক সময় মুনকার ও গর্হিত কর্ম দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এই ক্রোধের আগুন এমনই উত্তপ্ত হয় যে, শুধুমাত্র এলেম ও পরহেজগারী দ্বারা তাহা প্রশমন করা যায় না। বরং সচ্চরিত্রতার পানি দ্বারা তাহা নির্বাপন করিতে হয়। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিই যথার্থ পরহেজগার ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যে নিজের নফসকে পরিপূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

মোটকথা, আদেশ ও নিষেধকারীর মধ্যে যখন তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটে, তখন তাহার এই আমল দ্বীনের জন্য নুসরত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপাদান হয়। পক্ষান্তরে মুহতাসিবের মধ্যে যখন এই সব গুণের অভাব থাকে, তখন ইহ্‌তিসাবের আমলে অসঙ্গত উপায়, অযৌক্তিক ডাঁট-ধমক, প্রহার ইত্যাদি কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পরিণতিতে ইহ্‌তিসাবের মূল আমলটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে হয়ত আল্লাহর দ্বীন হইতে গাফেল হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ফিকিরে জড়াইয়া পড়ে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উপর আমল করিয়া থাকে। সুতরাং যখনই তাহারা দেখিতে পায় যে, তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন উপসর্গ দেখা দিয়াছে, তখনই আদেশ-নিষেধের আমল ত্যাগপূর্বক নিজের ফিকিরে লাগিয়া যায়।

উপরোক্ত তিনটি গুণের কারণে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছাওয়াবের কাজে পরিণত হয় এবং অসৎ ও গর্হিত কর্ম দমনে এই তিনটি গুণ কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি এইসব গুণ হইতে বঞ্চিত, সেই ব্যক্তি অসৎ কর্ম দমনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করিতে পারে না। বরং ক্ষেত্র

বিশেষ শরীয়তের সীমা লংঘনের ফলে তাহার অসৎ কর্ম দমনের আমলটিই অসৎ কর্মে পরিণত হয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সেই ব্যক্তি করিবে যে আদেশ করার সময় নম্রতা অবলম্বন করে এবং নিষেধ করার সময়ও বিনম্র আচরণ প্রদর্শন করে। আদেশ করার সময় সহনশীল হয় এবং নিষেধ করার সময়ও সহনশীলতা অবলম্বন করে। আদেশ করার সময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং নিষেধ করার সময়ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা ইহা জানা গেল যে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী ব্যক্তি মৌলিকভাবেই ফাহীম ও বুদ্ধিমান হওয়া জরুরী নহে। বরং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও সমঝদার হওয়া জরুরী। নম্রতা ও সহনশীলতার ক্ষেত্রেও একই কথা। আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রেও বিনম্র ও সহনশীল হইতে হইবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এরশাদ করেন, তুমি সৎ কাজের আদেশদাতাদের দলভুক্ত হইতে চাহিলে তোমাকেও সৎ কাজের উপর সকলের অধিক আমল করিতে হইবে। কোন কবি বলেন–

لا تلم المرء على فعله + و أنت منسوب الى مثله

من ذم شيئا و اتى مثله + فانما يزري على عقله

অর্থাৎ– "তুমি অপরকে এমন কোন কাজের তিরস্কার করিও না, যাহা দ্বারা তোমাকেও অভিযুক্ত করা যায়। যেই ব্যক্তি কোন কাজের নিন্দা করে, অথচ সে নিজেও উহাতে লিপ্ত; তবে সে যেন নিজের নির্বুদ্ধিতার বিলাপ করে।"

অবশ্য আমরা এই কথা বলি না যে, যেই ব্যক্তি নিজে অসৎ কর্মে লিপ্ত, তাহার পক্ষে সৎ কাজের আদেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়। বরং আমাদের বক্তব্য হইল– সৎ কাজের আদেশদাতা নিজে সৎ কর্মশীল না হইলে মানুষের অন্তরে তাহার কথার তাছীর হয় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশের জন্য যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ ও গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়া জরুরী নহে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম–

يا رسول الله ! لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به و لا نهي عن المنكر حتى نجتنبه كله، نقال صلى الله عليه وسلم، بل مروا بالمعروف و ان لم تعملوا به و انهو عن المنكر دان لم تجتنبوه كله (طبراني صغير و اوسط)

অর্থঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি সৎ কাজের আদেশ করিব না, যেই পর্যন্ত নিজেরা সেই সৎ কাজের উপর আমল না করিব? এবং আমরা কি অসৎ কাজের নিষেধ করিব না, যেই পর্যন্ত নিজেরা সকল মন্দ কাজ হইতে বিরত না থাকিব? তিনি এরশাদ করিলেনঃ না, তোমরা বরং সৎ কাজের আদেশ কর, যদিও নিজেরা সকল সৎ কাজ করিতে না পার এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর, যদিও নিজেরা সকল অসৎ কাজ হইতে বিরত না থাক।"

এক বুজুর্গ তাঁহার পুত্রগণকে ওসীয়ত করিয়া বলেন, তোমরা যখন সৎ কাজের আদেশ করার ইচ্ছা করিবে, তখন মনকে সবর ও ধৈর্য ধারণে অভ্যস্থ করিয়া লইবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উহার আজর ও বিনিময় লাভের দৃঢ় একীন পোষণ করিবে। যেই ব্যক্তি ছাওয়াব প্রাপ্তির একীনের সহিত কোন আমল করে, ঐ আমলের কারণে কোনরূপ নির্যাতন হইলেও তাহাতে সে কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আদেশ ও নিষেধের একটি আদব হইল, ধৈর্য ধারণ করা। এই কারণেই পবিত্র কোরআনে সৎ কাজের আদেশের পাশাপাশি ধৈর্য ধারণের কথা উল্লেখ হইয়াছে। যেমন সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে হযরত লোকমান আলাইহিস্ সালামের একটি উক্তি এইভাবে উল্লেখ হইয়াছে–

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

অর্থঃ "হে বৎস! নামাজ কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ কর, মন্দ কাজের নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর।" (সূরা লোকমানঃ আয়াত ১৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের আরেকটি আদব হইল– পার্থিব সম্পর্ক কমাইয়া দেওয়া। ফলে এই কাজে কোনরূপ ভয় ও প্রতিবন্ধক থাকিবে না। অনুরূপভাবে কাহারো নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা না করা। উহার ফলে মানুষকে তোষামোদ ও তোয়াজ করিয়া চলার প্রয়োজন হইবে না।

কথিত আছে যে, এক বুজুর্গ একটি বিড়াল পালিতেন। বিড়ালটির জন্য তিনি প্রতিদিন এক কসাইর দোকান হইতে গোশতের হাড়-পর্দা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এক দিন বুজুর্গ সেই দোকানে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কসাই একটি অন্যায় কাজ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিড়ালের জন্য খাবার না লইয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি বিড়ালটিকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া পুনরায় কসাইর দোকানে আসিয়া তাহাকে অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। কসাই বুজুর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কোন দিন আপনার বিড়ালের জন্য আমি খাবার দিব না। বুজুর্গ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে? বিড়ালটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবার

পরই আমি তোমাকে নিষেধ করিতে আসিয়াছি। এখন তোমার নিকট আমি কিছুই পাওয়ার আশা করি না।

বস্তুতঃ যেই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার পক্ষে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি সকলের নিকট ভাল থাকিতে চাহে এবং এইরূপ কামনা করে যে, মানুষ যেন সর্বদা আমার প্রশংসা করে, সেই ব্যক্তির পক্ষেও মানুষকে অন্যায় কাজে বাঁধা দেওয়া সম্ভব হয় না।

হযরত কা'ব আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কওমের মধ্যে আপনার মর্যাদা কেমন? জবাবে তিনি বলিলেন, কওমের লোকেরা আমাকে খুব ইজ্জত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে কিন্তু এই বিষয়ে অন্য রকম লিখিত আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে কি লিখিত আছে? হযরত কা'ব বলিলেন, তাওরাত কিতাবে লিখিত আছে, মানুষ যখন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, তখন কওমের লোকদের মধ্যে তাহার মর্যাদা হ্রাস পায় এবং লোকেরা তাহাকে খারাপ বলিতে থাকে। এইবার আবু মুসলিম খাওলানী বলিলেন, তাওরাত কিতাবের উক্তি যথার্থ এবং আবু মুসলিম অসত্য বলিয়াছে।

অন্যায়ের প্রতিরোধঃ নম্রতার সহিত

একবার জনৈক ওয়ায়েজ খলীফা মামুনকে কোন গর্হিত কাজ করিতে দেখিয়া কঠোর ভাষায় সদুপদেশ দিলে খলীফা মামুন তাহাকে বলিলেন, বড় মিয়া! একটু নরম ভাষায় কথা বলুন। দেখুন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আর ফেরাউন আমার চাইতেও নিকৃষ্ট ছিল। অথচ আল্লাহ্ পাক এই ফেরাউনকে নসীহত করা প্রসঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া বলিলেন-

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

অর্থঃ "অতঃপর তোমরা তাহাকে নম্র কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করিবে অথবা ভীত হইবে।" (সূরা তোয়াহাঃ আয়াত ৪)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের কর্তব্য, এই ক্ষেত্রে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের নীতি অনুসরণ করা। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক যুবক নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আয় আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে যিনা করার অনুমতি প্রদান করেন? যুবকের এই (অসঙ্গত) উক্তি শুনিয়া উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম উত্তেজিত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু

আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট আন। অতঃপর সে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এইবার তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল তো, তোমার মা যিনা করুক, ইহা কি তুমি পছন্দ করিবে? যুবক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলঃ আয় আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আমি ইহা কখনো পছন্দ করিব না। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মানুষের অবস্থা এইরূপই যে, তাহারা মায়ের যিনা সহ্য করিতে পারে না। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তোমার কন্যার জন্য যিনা পছন্দ করিবে? যুবক আরজ করিলঃ না, আয় আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন আপনার উপর উৎসর্গ হউক। তিনি এরশাদ করিলেনঃ মানুষের অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা নিজেদের কন্যার যিনা সহ্য করিতে পারে না। অতঃপর তিনি বোন এবং ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী খালা ও ফুফু সম্পর্কেও এইরূপ প্রশ্ন করিলে প্রতিবারই সে জবাব দিল যে, আমার প্রাণ আপনার উপর উৎসর্গ হউক, আমি ইহা পছন্দ করিব না। অতঃপর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দস্ত মোবারক যুবকের বক্ষে স্থাপনপূর্বক এইরূপ দোয়া করিলেন–

اللهم طهر قلبه و اغفر ذنبه و حصن فرجه

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! তাহার অন্তর পরিষ্কার করিয়া দিন, তাহার গোনাহ ক্ষমা করুন এবং তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করুন।"

বর্ণনাকারী হযরত আবু উমামা (রাঃ) বলেন, উপরোক্ত ঘটনার পর যুবকের নিকট যিনার মত এমন যঘন্য পাপ আর কিছু ছিল না। (আহমাদ)

এক ব্যক্তি হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজের নিকট আসিয়া হযরত সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি বাদশাহর দান গ্রহণ করেন, ইহা কেমন? হযরত ফোজায়েল বলিলেন, তিনি তো বাদশাহর নিকট হইতে কেবল নিজের প্রাপ্যই গ্রহণ করেন– ইহাতে তোমার এত আপত্তি কেন? পরে অভিযোগকারী চলিয়া গেলে তিনি হযরত সুফিয়ানকে একান্তে ডাকাইয়া তাম্বীহ করিলেন এবং বাদশাহর দান গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হযরত সুফিয়ান বলিলেন, হে আবু আলী! যদিও আমি নিজে নেক নহি, কিন্তু নেককার ব্যক্তিগণকে আমি মোহাব্বত করি, (কেননা, আমি আপনার কথাকে খারাপ মনে করি না এবং আপনি যাহা নসীহত করেন তাহা নির্দ্বিধায় মানিয়া লই)।

হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেন, একদা ছেলা ইবনে আশয়ামের নিকট এক ব্যক্তি আগমন করিল, তাহার পাজামা গিঁঠের নীচে ঝুলিতেছিল। উপস্থিত লোকেরা তাহাকে তিরস্কার করিতে চাহিলে তিনি সকলকে বাঁধা দিয়া বলিলেন,

তোমরা তাহাকে কিছু বলিও না, তাহার জন্য আমিই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি লোকটিকে নিকটে বসাইয়া নরম ভাষায় বলিলেন, ভাতিজা! তোমার সঙ্গে আমার একটি কথা আছে। লোকটি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে আপনার কি কথা আছে বলুন। তিনি বলিলেন, আমার ইচ্ছা, তোমার পাজামাটি গিঁঠের একটু উপরে পরিধান কর, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি? লোকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল– "বেশ ভাল কথা, চাচাজান! ইহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে?" এই কথা বলিয়াই সে পাজামা গিঁঠের উপরে উঠাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। লোকটি চলিয়া যাওয়ার পর ছেলা ইবনে আশয়াম উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা যদি তাহার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করিতে, তবে জবাবে সেও হয়ত তোমাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করিত এবং রাগের মাথায় বিরক্ত হইয়া তোমাদের নসীহত প্রত্যাখ্যান করিত।

মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া গালাবী নিজের চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ একদিন মাগরিবের নামাজ আদায়ের পর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। পথে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক কোরাইশী যুবক মদ পানে মাতাল অবস্থায় এক নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, আর বিপন্ন নারীটি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া মানুষের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। তাহার চিৎকার শুনিয়া আশেপাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া যুবককে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ যুবকটিকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন। তিনি আগাইয়া গিয়া লোকজনকে বলিলেন, আমার ভাতিজাকে ছাড়িয়া দাও। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে তিনি যুবককে নিকটে আহবান করিলে সে লজ্জায় অবনত মস্তকে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। হযরত আব্দুল্লাহ তাহাকে স্বস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে ঘরে চল। যুবক নীরবে তাহাকে অনুসরণ করিল। ঘরে আসিয়া তিনি খাদেমকে বলিলেন, ইহাকে তোমার সঙ্গে শোয়াইয়া রাখ এবং নেশা কাটিয়া যাওয়ার পর তাহাকে জানাইবে যে, সে মাতাল অবস্থায় কি কি কাণ্ড করিয়াছিল। আর আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া তাহাকে যাইতে দিবে না।

নেশা কাটিয়া যাওয়ার পর খাদেমের নিকট ঘটনা শুনিয়া যুবক যারপর নাই লজ্জিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে তাহাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদের নিকট হাজির করা হইলে তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বাপদাদার বংশে কালিমা লেপন করিয়া এমন কাণ্ড করিতে তোমার কি একটুও লজ্জা হইল না? তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ তুমি কেমন মানুষের ছেলে? তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আজ হইতে তওবা কর– জীবনে আর কখনো এইরূপ কাজ করিবে না। যুবক লজ্জায় মাথা নত করিয়া চোখের পানি বর্ষণ

করিতেছিল। পরে সে অনুশোচনায় বিদগ্ধ হৃদয়ে আরজ করিল, চাচাজান! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনে আর কখনো মদ ও নারী স্পর্শ করিব না। আমি আমার কৃতকর্মে অনুতপ্ত এবং এই অপরাধের জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা করিতেছি। আপনিও আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করুন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ যুবকের বক্তব্য শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং স্বস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, বহুত আচ্ছা বেটা, আল্লাহ্ পাক তোমার ভালাই করুন।

উক্ত যুবক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদের আদর-স্নেহ এবং তাঁহার আন্তরিক নসীহতে এমন প্রভাবিত হইল যে, অতঃপর সে আর কিছুতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিল না এবং তাঁহার খেদমতে থাকিয়া হাদীছ শিক্ষা করিতে লাগিল।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোহাম্মদ বলেন, লোকেরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে বটে কিন্তু (কঠোরতা ও রূঢ় ব্যবহারের কারণে) তাহাদের "সৎ কাজের আদেশ" অসৎ কাজে পরিণত হয়। সুতরাং তোমরা সকল কাজে নম্রতা ও বিনম্র আচরণ অবলম্বন করিও। বিনয় ও বিনম্র আচরণ দ্বারাই তোমরা অতি সহজে ও উত্তমভাবে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে।

ফাতাহ ইবনে শাখরাফ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি পথের উপর এক নারীকে জোরপূর্বক ধরিয়া তাহার শ্লীলতা হানীর চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় অসহায় নারীটির চিৎকারে তথায় কতক লোক আসিয়া জড়ো হইল বটে, কিন্তু দুর্বৃত্তটি ছিল খুবই শক্তিশালী এবং তাহার হাতে ছিল একটি ছোরা। কেহ সামনে আগাইতে চাহিলেই সে ছোরা দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত। এই কারণে কেহই অসহায় নারীটিকে দুর্বৃত্তের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেছিল না।

ইত্যবসরে প্রখ্যাত সূফী হযরত বিশর ইবনে হারেস সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং আপন কাঁধ দ্বারা দুর্বৃত্তের কাঁধ স্পর্শ করিয়াই তথা হইতে চলিয়া গেলেন। হযরত বিশরের এই কাঁধ স্পর্শে এমন কি শক্তি ছিল তাহা আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। এই সামান্য স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিধর লোকটি মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িল এবং মহিলাটিও মুক্তি পাইয়া অক্ষত অবস্থায় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত লোকজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরে তাহারা ভূতলশয়ী লোকটির নিকট আগাইয়া গিয়া দেখিল, সে প্রবল বেগে হাঁপাইতেছে এবং তাহার সমস্ত দেহ হইতে ক্রমাগত ঘাম বাহির হইতেছে। এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে? লোকটি ভীত-সন্ত্রস্ত

অবস্থায় জবাব দিল, আমি তো কিছুই বলিতে পারিব না। আমার কেবল এতটুকু মনে আছে, এক বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাকে এবং তোমার কর্ম দেখিতেছেন। এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত দেহে প্রবল বেগে কম্পন শুরু হইয়া গেল এবং পদযুগল অবশ হইয়া আমি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলাম। আমি বলিতে পারিব না, সেই লোকটি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছিলেন। লোকেরা তাহাকে জানাইল, তিনি ছিলেন বিশর ইবনে হারেস। এই কথা শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, হায় আমার দুর্ভোগ! এখন তিনি আমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং আমার সম্পর্কে তিনি কি ধারণা পোষণ করিবেন? এই ঘটনায় সে ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং সপ্তম দিবসে তাহার ইন্তেকাল হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন পর্যায়ে গর্হিত কর্ম

এই পর্যায়ে আমরা কতক মুনকার বা গর্হিত কর্ম এবং উহার হুকুম বর্ণনা করিব। অবশিষ্ট গর্হিত কর্মসমূহ বর্ণিত বিবরণের ভিত্তির উপর কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, মুনকার বা গর্হিত কর্ম দুই প্রকার। মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। মাকরূহ বিষয়ে নিষেধ করা মোস্তাহাব এবং উহাতে নীরব থাকা মাকরূহ; হারাম নহে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি তাহার কর্মটি মাকরূহ হওয়া বিষয়ে জ্ঞাত না থাকে, তবে এই বিষয়ে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। নিষিদ্ধ বিষয়ে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঁধা না দেওয়া এবং নীরব থাকা হারাম। এই জাতীয় গর্হিত কর্ম মসজিদে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে এবং অপরাপর স্থানসমূহে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা পৃথক শিরোনামে উহার উপর আলোচনা করিব।

মসজিদে গর্হিত কর্ম

প্রথম মুনকার

এক শ্রেণীর মানুষ মসজিদের ভিতরও বিবিধ মুনকার ও গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়। যেমন অনেকে নামাজের রুকু-সেজদাহ্গুলিতে বেশ তাড়াহুড়া করিয়া থাকে। অথচ নামাজে এইরূপ তাড়াহুড়া করা একটি গর্হিত কর্ম এবং উহার ফলে নামাজ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কাহাকেও এইরূপ করিতে দেখিলে তাহাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। অবশ্য হানাফী মাজহাব মতে এই তাড়াহুড়ার কারণে নামাজ বাতিল হয় না।

দ্বিতীয় মুনকার

অনেকে কোরআন শরীফ ভুল তেলাওয়াত করিয়া থাকে। এইরূপ তেলাওয়াতে বাধা দেওয়া এবং সঠিক তেলাওয়াত শিক্ষা করিতে উদ্বুদ্ধ করা ওয়াজিব। যেই সকল ব্যক্তি মসজিদে এতেকাফের হালাতে ক্রমাগতভাবে জিকির-আজকার ও নফল এবাদতে মশগুল নহে; তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় কর্মে বাধা দেওয়া উচিৎ। কেননা, এই আমলটি জিকির ও নফল এবাদত অপেক্ষা অধিক ফজিলতপূর্ণ। কারণ, নফল এবাদতের ফায়দা কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। আর "অন্যায় ও গর্হিত কর্মে বাধা প্রদান" এর ফলে অপরাপর লোকেরা উপকৃত হয়। অর্থাৎ এই আমল দ্বারা নিজেরও ছাওয়াব হাসিল হয় এবং অপরাপর মানুষকেও ছাওয়াব হাসিলের পথ করিয়া দেওয়া হয়।

অন্যায় কর্মে বাধা প্রদানের ফলে যদি নিজের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে এই ক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, তাহার নিকট কি পরিমাণ সম্পদ আছে। যদি দেখা যায়, জরুরত পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থা আছে, তবে গর্হিত কর্মে বাঁধা দেওয়া উচিৎ। কেননা, অতিরিক্ত রোজগারের আশায় "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ" বর্জন করা জায়েজ নহে। তবে সেই ব্যক্তির নিকট যদি কেবল এক দিনের খোরাক মওজুদ থাকে, তবে তাহাকে অক্ষম ও মাজুর মনে করা হইবে এবং তাহার জিম্মা হইতে অন্যায়ের প্রতিরোধের দায়িত্ব রহিত হইয়া যাইবে।

কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে যেই ব্যক্তি অতিরিক্ত ভুল করে, সেই ব্যক্তি যদি তাহার তেলাওয়াত শুদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, তবে শুদ্ধ না করা পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা, আল্লাহর কালাম অশুদ্ধ তেলাওয়াত করিলে গোনাহগার হইবে। এমতাবস্থায় কেবল সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করিবে এবং উহা বিশুদ্ধভাবে শিক্ষা না করা পর্যন্ত অন্য সূরা পাঠ করিবে না। সূরা ফাতেহা শুদ্ধ হওয়ার পর অন্য সূরা মশক করিবে। অবশ্য জিহবার জড়তার কারণে যদি চেষ্টা করিবার পরও ভুল হইয়া যায়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাকে অপারগ মনে করা হইবে। যেই ব্যক্তি অধিকাংশ কোরআনই শুদ্ধভাবে পড়িতে পারে কিন্তু হঠাৎ হয়ত কোন কোন স্থানে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হইয়া যায়– এইরূপ ভুলের জন্য কোন ক্ষতি হইবে না।

তৃতীয় মুনকার

আমভাবে প্রায় সকল মসজিদেই আজানের শব্দগুলি অকারণে লম্বা করিয়া টানা হয়। আবার অনেক মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাচ্ছালাহ্" ও "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় নিজের বক্ষ কেবলার দিক হইতে একেবারে ঘুরাইয়া ফেলে। এইসব বিষয় গর্হিত ও মাকরূহ। মুয়াজ্জিনকে এইসব বিষয় জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। যদি তাহারা জ্ঞাতসারে এইরূপ করে, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব।

চতুর্থ মুনকার

খতীবের পক্ষে এইরূপ কালো পোশাক পরিধান করা যাহাতে রেশমী সুতা অধিক কিংবা হাতে সোনালী তলোয়ার থাকা পাপ বিধায় নিষেধ করা ওয়াজিব। কিন্তু যেই পোশাক শুধুই কালো এবং যাহাতে কোন রেশমী সুতা নাই তাহা পরিধান করা মাকরূহ নহে। কিন্তু কালো রং এর পোশাক পছন্দনীয়ও বলা যাইবে না। কেননা, আল্লাহ পাকের নিকট সাদা পোশাকই অদিক পছন্দনীয়। কালো পোশাককে যাহারা মাকরূহ ও বেদআত বলিয়াছেন তাহাদের এই উক্তির ভিত্তি হইল– ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই জাতীয় পোশাক ব্যবহারে প্রচলন

ছিল না। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইল, এই পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আসে নাই, সুতরাং উহাকে "উত্তম নহে" বলা যাইতে পারে, কিন্তু মাকরূহ ও বেদআত বলা যাইবে না।

পঞ্চম মুনকার

যেই ওয়ায়েজ মিথ্যা কল্প-কাহিনী ও বেদআতপূর্ণ কথাবার্তা আলোচনা করে, সে ফাসেক। তাহাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। বেদআতী ওয়ায়েজদের মাহ্‌ফিলে যোগদান করা উচিৎ নহে। অবশ্য বেদআতী ওয়ায়েজদের বক্তব্য খণ্ডন বা নিষেধ করার উদ্দেশ্যে যাওয়া যাইবে। যদি শক্তি থাকে তবে উপস্থিত সকল শ্রোতাকে কিংবা যেই পরিমাণ শ্রোতাকে সম্ভব হয় সেই ওয়াজ শুনিতে নিষেধ করিবে। মিথ্যাবাদী ওয়ায়েজগণের মিথ্যা ভাষণ খণ্ডন করিয়া প্রকৃত অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। যদি এইরূপ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে এই ধরনের মাহ্‌ফিলে যাওয়া এবং বেদআতী ওয়াজ শোনার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ পাক তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়া বলেন-

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

অর্থঃ "তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যান, যেই পর্যন্ত তাহারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়।" (সূরা আনআমঃ আয়াত ৬৮)

এমন ওয়ায়েজের ওয়াজও মুনকার বা গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত যাহা শুনিলে পাপকর্মে সাহসবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ যেইসব ওয়াজে আল্লাহ পাকের রহমত, মাগফেরাত ও আশার বাণী খুব বেশী বর্ণনা করা হয়, তাহা শ্রবণ করিলে পাপের শাস্তি ও ভয়াবহতার অনুভূতি হ্রাস পাইয়া অন্তর হইতে আল্লাহর ভয় দূর হইয়া যায়। সুতরাং এইরূপ গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। বর্তমান যুগে আশার বাণী অপেক্ষা ভয় ও আজাবের কথা অধিক বর্ণনা করা হিতকর। তবে এককভাবে রহমতের বাণী না শোনাইয়া পাশাপাশি আশা ও ভয়ের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন যদি এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, শুধু মাত্র একজন মানুষ ব্যতীত অন্য সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তবে আল্লাহর রহমতের উপর আমি এইরূপ আশাবাদী যে, জাহান্নাম হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই একমাত্র ব্যক্তিটি হয়ত আমিই হইব। অনুরূপভাবে যদি এইরূপ ঘোষণা দেওয়া হয় যে, সমস্ত মানুষ জান্নাতে যাইবে এবং শুধু এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তবে সেই ক্ষেত্রেও আমার অন্তরে এমন ভীতি বিরাজ করিবে যে, সেই একমাত্র জাহান্নামী ব্যক্তিটি আমিই হই কি-না।

ওয়ায়েজ বয়সে যুবা হওয়া, ওয়াজের মধ্যে এশক-মোহাব্বত ও ভালবাসার বয়াত বেশী বেশী পাঠ করা, অঙ্গ-ভঙ্গিমা করিয়া দর্শক শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, অপরূপ সাজ-গোজে নারীগণ মাহ্ফিলে অংশ গ্রহণ করা– এই সবও গর্হিত কর্মের মধ্যে গণ্য এবং ইহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। কারণ, এই ধরনের ওয়াজ মানুষের সংশোধনের পরিবর্তে বিপর্যয়ের কারণ হইয়া থাকে। ওয়ায়েজের ধরন-ধারণ, লেবাস-পোশাক ও সুন্নতের এত্তেবা' ইত্যাদি দেখিয়াই অনুমান করা যাইবে যে, তিনি কোন্ ধরনের ওয়ায়েজ এবং তাহার ওয়াজ দ্বারা মানুষের উপকার হইবে, না অপকার। যদি ফেৎনার আশংকা হয় তবে নারীগণকে নামাজের জন্য মসজিদে এবং ওয়াজ মাহফিলে আসিতে দেওয়া যাইবে না। সে মতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে নারীগণকে বাধা দিলে কেহ উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নারীগণকে জামায়াতে শরীক হইতে নিষেধ করিতেন না, কিন্তু আপনি নিষেধ করিতেছেন কেন? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইহা জানিতে পারিতেন যে, তাহার পরে নারীগণ কি কি অবস্থা সৃষ্টি করিবে, তবে নিশ্চয়ই নিষেধ করিতেন।

(বোখারী, মুসলিম)

ষষ্ঠ মুনকার

জুমুআর দিন ঔষধ, খাবার, তাবিজ ইত্যাদি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া। ভিক্ষুকগণ মুসল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত ও কবিতা আবৃত্তি করা ইত্যাদি সবই গর্হিত কর্ম। তবে এই সবের মধ্যে কোন কোনটি মিথ্যা ও প্রতারণার কারণে হারাম। যেমন ঔষধ বিক্রেতাদের রোগ নিরাময়ের মিথ্যা আশ্বাস, জাদুকর ও তাবিজ কারকদের প্রতারণা ইত্যাদি। এইসব লোকেরা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করিয়া তাহাদের নিকট পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চাই তাহা মসজিদের ভিতরে হউক বা বাহিরে, সর্ব ক্ষেত্রে তাহা মুনকার। এই মুনকার হইতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। কোন কোন কর্ম যেমন কাপড় সেলাই করা, কিতাব ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা মসজিদের বাহিরে সাধারণভাবে মোবাহ এবং মসজিদের অভ্যন্তরে ওজরের কারণে হারাম। যেমন– নামাজীদের জায়গা সংকীর্ণ হইয়া যাওয়া বা এই ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কথাবার্তার আওয়াজের কারণে নামাজে বিঘ্ন ঘটা ইত্যাদি। আর এই ধরনের কোন অসুবিধা না হইলে তাহা জায়েজ বটে, কিন্তু এই জাতীয় কর্ম মসজিদে না করাই উত্তম। মোটকথা, মসজিদকে বাজারে পরিণত করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং এইরূপ করিলে অবশ্যই বাধা দিতে হইবে।

কোন মোবাহ্ কর্ম যখন স্বল্প পরিমাণে করা হয় তখন তাহা মোবাহের পর্যায়েই থাকে বটে, কিন্তু এই মোবাহ্ কর্মই যখন বার বার ও ক্রমাগতভাবে করা হয় তখন তাহা গোনাহের কাজে পরিণত হয়। যেমন ছগীরা গোনাহ্ যখন বার বার করা হয় তখন তাহা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মসজিদের অভ্যন্তরেও কোন সাধারণ কর্ম স্বল্প পরিমাণে করার সুযোগে যদি তাহা অধিক পরিমাণে শুরু হওয়ার আশংকা হয়, তবে স্বল্প পরিমাণের সূচনাতেই উহাকে বাধা দিতে হইবে। তবে এই বাধা দেওয়ার দায়িত্ব শাসনকর্তা, শাসনকর্তার প্রতিনিধি বা মসজিদের মুতাওয়াল্লীর। কেননা, স্বল্প পরিমাণ ও অধিক পরিমাণের পার্থক্য করা এবং স্বল্প পরিমাণের সুযোগে অধিক পরিমাণ শুরু হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ধারণ– ইত্যাদি বিষয়গুলি ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ইজতিহাদ সাধারণ মানুষের কাজ নহে।

সপ্তম মুনকার

পাগল, মাতাল ও বালকদের মসজিদে আসা গর্হিত কর্ম। বালকরা মসজিদে আসিয়া যদি ক্রীড়া-কৌতুক না করে, তবে তাহাদের প্রবেশে কোন ক্ষতি নাই। এই কথা ঠিক যে, বালকরা মসজিদে খেলা করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া নীরব থাকা হারাম নহে, কিন্তু মসজিদকে যদি নিয়মিত খেলার স্থানে পরিণত করা হয় এবং মসজিদে আসিয়া খেলা করা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। মসজিদে বালকদের খেলাধুলার ক্ষেত্রেও যদি তাহা স্বল্প মাত্রায় হয় তবে তাহা জায়েজ। আর বেশী মাত্রায় হইলে তাহা হারাম।

উন্মাদ ও পাগল যদি মসজিদে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে, অশ্লীল কথা ও বকাবকি না করে, মসজিদকে নাপাক না করে এবং উলঙ্গ না হয়, তবে তাহাদিগকে মসজিদে প্রবেশে বাধা দেওয়া বা ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে না। নেশাখোরেরও এই হুকুম। অর্থাৎ অশ্লীল কথন ও বচনের আশংকা হইলে মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া ওয়াজিব।

যদি বলা হয়, নেশাখোরকে প্রহার করিয়া মসজিদ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ যেন ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়া যায়, তবে আমরা বলিব, তাহাকে প্রহার ও মসজিদ হইতে বহিষ্কার না করিয়া বরং মসজিদের ভিতরেই বসাইয়া নসীহত কর যেন সে নেশা ও মাদক সেবন ত্যাগ করে। অবশ্য ইহা সেই ক্ষেত্রে, যখন নেশার কারণে সে মাতাল না হইবে এবং তাহার হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকিবে।

কাহারো মুখ হইতে শরাবের গন্ধ আসিলেই এমন মনে করা যাইবে না যে, সে শরাব পান করিয়াছে। কেননা, এমনও হইতে পারে যে, সে শরাবের মজলিসে বসিয়া ছিল বা মুখে শরাব লইয়া তাহা পান না করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অবশ্য তাহার চালচলন দ্বারা যদি শরাব পান করা প্রমাণিত হয়, যেমন- টলিতে টলিতে চলা বা এমন কোন আচরণ করা যাহা সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ করে না, অর্থাৎ স্পষ্টরূপে যদি জানা যায় যে, সে নেশা করিয়াছে, তবে এই অবস্থায় তাহাকে মসজিদে বা অন্য যেকোন স্থানেই পাওয়া যাইবে, কঠোরভাবে বাধা দিতে হইবে, যেন ভবিষ্যতের জন্য সে সতর্ক হয় এবং নেশার বাহ্যিক লক্ষণ জাহির করিয়া না বেড়ায়। কেননা, অন্যায় কর্ম প্রকাশ করাও অন্যায়। অন্যায় কর্ম বর্জন করা যেমন ওয়াজিব, তদ্রূপ কোন কারণে অন্যায়ে জড়াইয়া পড়িলেও সেই অন্যায় গোপন করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি যদি তাহার অপরাধ গোপন করিয়া রাখে, তবে তাহা লইয়া ঘাটাঘাটি করা যাইবে না।

বাজারে গর্হিত কর্ম

হাটে-বাজারেও বিবিধ গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে আমরা উদাহরণসহ উহার কতক অবস্থা উল্লেখ করিব।

প্রথম মুনকার

পন্য বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত লাভ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা অন্যায় ও গর্হিত কর্ম। কোন বিক্রেতা যদি বলে, আমি এই পণ্যটি এত টাকায় ক্রয় করিয়া এত টাকা লাভে এই দরে বিক্রয় করিব, তবে এই ক্ষেত্রে যদি সে মিথ্যা বলিয়া থাকে, তবে সে ফাসেক। এখন কোন ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য জানা থাকে, তবে ক্রেতাকে মিথ্যা সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি দোকানদারের খাতিরে নীরব থাকে, তবে এই খেয়ানতে সে বিক্রেতার অংশীদার হইয়া গোনাহগার হইবে।

দ্বিতীয় মুনকার

পণ্যের দোষ গোপন করা, যেন ক্রেতা সেই দোষ জানার কারণে ফেরৎ না যায়। ইহা সুস্পষ্টভাবেই মুনকার ও গর্হিত কর্ম। এখন কোন ব্যক্তির যদি এই দোষ জানা থাকে, তবে ক্রেতাকে জানাইয়া দেওয়া তাহার কর্তব্য। জানাইয়া না দিলে উহার অর্থ হইবে- একজন মুসলমানের আর্থিক ক্ষতিতে যেন তাহারও সম্মতি আছে। ইহা হারাম।

তৃতীয় মুনকার

ওজন ও মাপে কম করা– ইহাও মুনকার। অনেক দোকানদার প্রচলিত ওজনের কম বাটখারা এবং প্রচলিত মাপ হইতে খাটো গজ রাখে। কোন ব্যক্তির যদি দোকানদারের এই প্রতারণার কথা জানা থাকে, তবে তাহার কর্তব্য– হয় নিজে এই অন্যায় দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করা কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাহা দূর করার চেষ্টা করা।

চতুর্থ মুনকার

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ শর্ত করা। ইহা সুস্পষ্ট রূপেই গর্হিত কর্ম এবং ইহাতে বাঁধা দেওয়া ওয়াজিব। কেননা, অবৈধ শর্তের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সুদের লেনদেনেও বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

পঞ্চম মুনকার

ঈদ বা অন্য কোন পর্ব উপলক্ষে শিশুদের জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত খেলনা ক্রয় করিয়া দেওয়া জায়েজ নহে। এই জাতীয় সামগ্রী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার বিক্রয় নিষেধ করা উচিৎ। সোনা-রূপার বরতন, রেশমী ও রূপার জরির টুপি এবং পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাকেরও একই হুকুম। ব্যবহৃত কাপড় ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া নূতন বলিয়া বিক্রয় করা জায়েজ নহে। অনুরূপভাবে ছিঁড়া কাপড় রিফু করিবার পর ক্রেতার নিকট সেই ত্রুটি গোপন করিয়া বিক্রয় করাও জায়েজ নহে।

মোটকথা, এমনসব বিক্রয় হারাম যাহাতে প্রতারণা করা হয়। এই জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় এমন ব্যাপক যে, উহার পরিসংখ্যান করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবে নমুনা হিসাবে আমরা যেই কয়টি অবস্থা বর্ণনা করিলাম উহার উপর ভিত্তি করিয়া অপরাপর ক্ষেত্রে কেয়াস করিয়া লওয়া যাইবে।

রাস্তা সংক্রান্ত গর্হিত কর্ম

মানুষের পথ চলাচল সংক্রান্ত মুনকার ও গর্হিত কর্ম অসংখ্য। এখানে আমরা নমুনা হিসাবে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। ঘরের বাহিরে পথের উপর বসার জন্য উঁচু চত্বর নির্মাণ করা, পথের উপর ঘরের বারান্দা, গ্যালারী, ছাদ ইত্যাদি নির্মাণ করা, গাছ লাগানো, খুঁটি পুতিয়া রাখা মুনকার। অর্থাৎ– এইসবের ফলে যদি পথ সংকীর্ণ হইয়া যায় বা পথিকের পথ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে তাহা মুনকার ও গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রাস্তা যদি খুব প্রশস্ত হয় এবং এইসব কর্মের ফলে পথিকের পথ চলাচলে কোন বিঘ্ন না ঘটে, তবে এই ক্ষেত্রে নিষেধ করা হইবে না।

অনুরূপভাবে রাস্তার উপর গরু-ছাগল এমনভাবে বাঁধা যাইবে না যাহাতে পথ সংকীর্ণ হয় এবং উহাদের বিষ্ঠা ও পেশাবের ছিটা পথিকের গায়ে লাগে। কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে নিষেধ করা হইবে। সওয়ারীতে আরোহণ ও অবতরণের জন্য জরুরত পরিমাণ সময় সওয়ারীকে পথে দাঁড় করানো মুনকার বা গর্হিত কর্ম নহে। কেননা, মানুষের উপকার ও জরুরতের জন্যই রাস্তা নির্মাণ করা হয়। তো জরুরতের জন্য সওয়ারীকে পথে দাঁড় করানো ইহাও মানুষের একটি উপকার বটে। এই উপকার লাভের ক্ষেত্রে কাহাকেও বাধা দেওয়া যাইবে না। অবশ্য কেহ যদি রাস্তার কিছু অংশকে নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লয়, তবে অবশ্যই তাহাকে বাধা দিতে হইবে।

মোটকথা, এইসব ক্ষেত্রে মানুষের জরুরতের প্রতি লক্ষ্য করা হইবে এবং সেই জরুরতটিও রাস্তার সহিত সংশ্লিষ্ট কি-না তাহা দেখিতে হইবে। মানুষের সকল জরুরতই এক রকম নহে। লোক চলাচলের পথ দ্বারা এমন কাঁটাযুক্ত বোঝা লইয়া যাওয়া যাইবে না যাহা দ্বারা পথিকের গায়ে আঁচড় লাগিতে পারে বা তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। অবশ্য রাস্তা যদি খুব প্রশস্ত হয় এবং বোঝার কারনে মানুষের কোন কষ্ট না হয়, তবে কোন আপত্তি নাই। কেননা মানুষকে তো এই পথ দ্বারাই বোঝা বহন করিতে হইবে। তবে কাঁটার বোঝা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পথে ফেলিয়া রাখা যাইবে না। বরং উহা রাস্তায় নামাইয়া স্থানান্তর করিতে যেই পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমাণ সময়ই রাস্তায় রাখা যাইবে। জীব-জানোয়ারের উপর উহার ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা চাপাইয়া দেওয়াও মুনকার এবং উহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে কসাই'র দোকানের সামনে পশু জবাই করা এবং উহার রক্ত ও মল-মুত্র দ্বারা রাস্তা নোংরা করিয়া রাখা- ইহাও গর্হিত কর্ম এবং ইহাতে বাধা দেওয়া হইবে। ঘরের ময়লা-আবর্জনা, আম-কলা ও তরমুজের ছিলকা ইত্যাদি যদি পথের উপর ফেলিয়া রাখা হয় এবং পানি ফেলিয়া রাস্তা পিচ্ছিল করিয়া রাখা হয়, তবে এইসব কর্ম গর্হিত এবং উহাতে বাধা দেওয়া হইবে।

কোন বাড়ীর ফটকে যদি এমন কুকুর বসিয়া থাকে, যে পথিকগণকে কামড়ায় বা তাহাদের উপর আক্রমণ করে, তবে উহাকে বাধা দেওয়া সেই বাড়ীর মালিকের উপর ওয়াজিব। কিন্তু কুকুর যদি কাহাকেও কষ্ট না দেয় এবং শুধুই ময়লা ছড়ায়, আর সেই ময়লা এমন যাহা এড়াইয়া চলা সম্ভব- তবে উহাকে বাধা দেওয়া হইবে না। কুকুর যদি পথের উপর এমনভাবে বসিয়া থাকে যে, উহার ফলে পথিকের পথ চলাচলে সমস্যা হইতেছে, তবে কুকুরের মালিককে বলা হইবে যেন সে তাহার কুকুরকে বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখে। এমন কি বাড়ীর মালিকও যদি পথিকের সমস্যা করিয়া রাস্তায় বসিয়া থাকে, তবে তাহাকেও নিষেধ করা হইবে।

মেহমানদারী সংক্রান্ত মুনকার

পুরুষ মেহমানদের বসিবার জন্য রেশমী চাদর বিছানো হারাম। অনুরূপভাবে সোনা-রূপার পাত্রে আগর-লোবান বা অন্য কোন খুশবু জ্বালানো, সোনা-রূপার পাত্রে গোলাবের পানি ছিটানো, অনুরূপ পাত্রে পানি পান করা ইত্যাদি সবই মুনকার। জীব-যন্তুর ছবি সম্বলিত পর্দা ঝুলানো হারাম। মেহমানদারীর মজলিসে গান-বাজনার আয়োজন করা মুনকার। সুতরাং ইহা নিষেধ করা হইবে।

অনেক সময় মেহমানদের আগমনের পর মহিলাগণ ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া থাকে। অথচ মেহমানদের মধ্যে এমন নওজয়ানও থাকে যাহাদের পক্ষ হইতে ফেৎনার আশংকা বিদ্যমান। সুতরাং ইহা নিষিদ্ধ এবং ইহাতে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেই ব্যক্তি এইসব গর্হিত কর্মে বাধা দিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে সেই মজলিসে বসা জায়েজ নহে। কম্বল, স্থাপিত আসন, তাকিয়া ও বিভিন্ন পাত্রে যেই নকশা ও দৃশ্য অঙ্কিত থাকে, ঐগুলি নাজায়েজ নহে। তবে কোন পাত্র যদি প্রাণীর আকৃতিতে বানানো হয়, যেমন গোলাবজল ছিটাইবার পাত্রটির শীর্ষভাগ হয়ত পাখীর মাথার আকৃতিতে বানানো হইল– তবে তাহা হারাম এবং এইসব পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। রূপার ক্ষুদ্র সুরমাদানী ব্যবহার করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) একবার রূপার সুরমাদানী দেখিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।

দাওয়াতের মজলিসের যঘন্য মুনকার সমূহের মধ্যে হইল– পরিবেশিত আহার হারাম হওয়া, সেই স্থানটি জবর দখলকৃত হওয়া ইত্যাদি। খাবার মজলিসে যদি কেহ শরাব পান করিতে থাকে, তবে তাহার নিকট বসিয়া খানা খাওয়া উচিত নহে। কেননা, যেই মজলিসে শরাব পান হইতে থাকে, সেই মজলিসে যাওয়া জায়েজ নহে।

এখানে যদিও সে নিজে শরাব পান করিতেছে না, কিন্তু ফাসেক যখন কোন গোনাহ্ করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট বসা জায়েজ নহে। অবশ্য ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে যে, ফাসেক গোনাহের কাজ শেষ করিবার পর তাহার নিকট বসা যাইবে কি-না।

দাওয়াতের মজলিসে যদি কেহ রেশমী পোশাক বা স্বর্ণের আংটি পরিয়া আসে তবে বিনা প্রয়োজনে তাহার নিকট বসা ঠিক নহে। কেননা, সে ফাসেক। কোন নাবালেগ ছেলে রেশমী পোশাক পরিয়া আসিলে কি করা হইবে, এই বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে সঠিক মত ইহাই যে, বালকটি যদি সমঝদার হয়, তবে তাহার পোশাক খুলিয়া ফেলিতে হইবে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

هذا حرامان على ذكور امتي

অর্থাৎ– "আমার উম্মতের পুরুষের জন্য এই দুইটি হারাম।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা)

উপরের হুকুমটি আম ও ব্যাপক। এখানে বালেগের জন্য বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। বর্ণিত হুকুমে যদি বালেগগনকে উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া মানিয়াও লওয়া হয়, তবুও ছোট বালকদিগকে রেশমী পোশাক পরিধান হইতে বাধা দেওয়া উচিৎ। যেমন নাবালেগ বালকদিগকে শরাব পান করা হইতে বাঁধা দেওয়া হয়। অথচ ছোট বালকদের উপর যেমন শরীয়তের কোন হুকুম কার্যকর নহে, তদ্রূপ কোন নিষিদ্ধ বিষয়ও তাহাদের উপর কার্যকর নহে। কিন্তু শরাব পান করা হইতে বাধা দেওয়ার কারণ ইহা নহে যে, তাহারা বালেগ; বরং উহার কারণ হইল, নাবালেগদের জন্য শরাব পান হারাম নহে বটে, কিন্তু এই সময় শরাব পানের সুযোগ দিলে তাহারা যদি উহায় অভ্যস্থ হইয়া পড়ে তবে বালেগ হওয়ার পর তাহাদের পক্ষে সেই অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন হইবে।

রেশমী পোশাকের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত অবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ নাবালেগ অবস্থায় যদি তাহারা রেশমী পোশাকে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে এবং উহার ব্যবহার শরীরের জন্য ভাল লাগিয়া যায়, তবে বালেগ হওয়ার পর সেই অভ্যাস ছাড়ানো সমস্যা হইবে। অবশ্য এমন কম বয়েসী শিশু, যে এখনো ভালমন্দ পার্থক্য করিতে পারে না তাহার কথা ভিন্ন। কেননা, কোন্ পোশাকটি ভাল আর কোন্টি মন্দ এবং অভ্যাস কাহাকে বলে, এইসব বিষয়ে এখনো তাহার সমঝ পয়দা হয় নাই। তবে উপরে বর্ণিত হুকুমটি যেহেতু আম এবং উহাতে কোন শ্রেণীবিশেষকে উল্লেখ করা হয় নাই; সুতরাং এই ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, নাবালেগদের জন্যও উহার হুকুম অভিন্ন হইবে– চাই তাহাদের মধ্যে ভালমন্দের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক।

অনেক সময় বেদআতী আকীদার লোক নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে জেয়াফতের মজলিসে আসিয়া অংশ গ্রহণ করে এবং এই সুযোগে তাহারা সাধারণ মানুষকে গোমরাহ্ করার চেষ্টা চালায়। যদি কোন মজলিসে এইরূপ লোকের উপস্থিতি জানা যায় এবং ইহাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, লোকটি নীরব থাকিবে না এবং কৌশলে তাহার অপতৎপরতা চালাইবেই; তবে এমন মজলিসে অংশ গ্রহণ বর্জন করিতে হইবে। অবশ্য কোন আলামত দ্বারা যদি ইহা জানা যায় যে, লোকটি তাহার মতবাদ প্রচার করিবে না বা প্রচার করিলেও যদি নিজের মধ্যে তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতির যোগ্যতা ও হিম্মত থাকে; তবে সেই ক্ষেত্রেও বেদআতীর বক্তব্যের প্রতিবাদ করার শক্তি ও নিয়ত

থাকার শর্তে অংশ গ্রহণ করা যাইবে। অন্যথায় উহাতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না।

কোন কোন জেয়াফতে কৌতুকী ও কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনাকারী লোক আনাইয়া তামাশার আয়োজন করা হয়। এইসব কিচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে যদি কোনরূপ অশ্লীলতা ও মিথ্যার সংমিশ্রণ থাকে, তবে তাহা গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত হইবে। পক্ষান্তরে সেইসব কিচ্ছা-কাহিনী যদি শুধুই লোকহাসানোর উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয় এবং উহাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অশ্লীলতা না থাকে, তবে তাহা শুনিতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও শর্ত হইল, এইসব কিচ্ছা-কাহিনীর আসর স্বল্প মাত্রায় হইতে হইবে।

এমনসব প্রকাশ্য মিথ্যা যাহা দ্বারা কাহাকেও প্রতারিত করা বা কাহারো উপর দোষারোপ করা উদ্দেশ্য না হয়– তাহা মুনকার ও গর্হিত কর্মের মধ্যে গণ্য হইবে না। যেমন কোন ব্যক্তি অপর কাহাকেও বলিল, "একশত বার তোমাকে নিষেধ করিলাম বা হাজার বার এই কথাটি বলিলাম"। অথচ এই উক্তিটি সত্য নহে এবং কস্মিনকালেও সে একশত বার বা হাজার বার বলে নাই। কিন্তু তবুও সকলের নিকট এই কথা বিদিত যে, এই ক্ষেত্রে বর্ণিত সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নহে; বরং কথাটির উপর তাকীদ ও জোর দেওয়াই উদ্দেশ্য। সুতরাং ইহা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হইবে না।

খানাপিনায় অতিরিক্ত খরচ করাও গর্হিত কর্ম। এইরূপ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের কর্তব্য– মেজবানকে অপব্যয় করিতে নিষেধ করা। দাওয়াতে অতিরিক্ত খানাপিনার আয়োজন করিলে উহাতে অপব্যয়ের পাশাপাশি আরেকটি অনিষ্ট হইল, সম্পদ বরবাদ করা। সম্পদ বরবাদের সংজ্ঞা হইল– কোন বস্তু বা সম্পদ কোনরূপ ফায়দা ব্যতীত সম্পূর্ণ অকারণে নষ্ট করিয়া দেওয়া। যেমন– কাপড় জ্বালাইয়া দেওয়া, ছিঁড়িয়া ফেলা, ঘর ধ্বসাইয়া দেওয়া বা অর্থ-কড়ি পানিতে ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে মাতমকারী ও গায়ককে বখশীশ দেওয়াও অর্থ বরবাদ করার মধ্যে গণ্য। কেননা, এইসব বিষয় শরীয়ত সম্মত নহে। সুতরাং এইসব কাজে সম্পদ ব্যয় করার অর্থ হইতেছে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনা ফায়দায় নিজের অর্থ বরবাদ করিয়া দিল। অপব্যয়ের বিষয়টি আরো ব্যাপক। কেবল গর্হিত কাজে অর্থ ব্যয় করাই অপব্যয় নহে; বরং বৈধ কাজে অতিরিক্ত ব্যয় করিলেও উহাকে অপব্যয় বলা হইবে। মানুষের জরুরত পরিমাণের বিষয়টিও সকলের ক্ষেত্রে এক রকম নহে। মানুষের অবস্থা ভেদে উহাতে পার্থক্য হইয়া থাকে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। যেমন এক ব্যক্তি বালবাচ্চা লইয়া ঘর সংসার করে। সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল এই ব্যক্তির সর্বমোট পুঁজি

একশত দিনার। ইহা ব্যতীত তাহার নিকট আর কোন অর্থ নাই। ওলীমার আয়োজনে সে এই সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া দিল। এখন ওলীমায় ব্যয় করা যদিও মোবাহ, কিন্তু এইরূপ স্বল্প আয়ের ব্যক্তির পক্ষে উহাতে একশত দিনার ব্যয় করা সুস্পষ্টভাবেই অপব্যয় এবং উহাতে নিষেধ করা ওয়াজিব। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۔

অর্থঃ "একেবারে মুক্তহস্ত হইও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হইয়া বসবাস করিবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ২৯)

উপরোক্ত আয়াতটি মদীনায় এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে, যেই ব্যক্তি তাহার যাবতীয় সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করিয়া দিয়াছিল। পরে যখন তাহার পরিবারের লোকেরা আবশ্যকীয় খরচের জন্য তাহার নিকট অর্থ চাহিল, তখন সে কিছুই দিতে পারিল না। অন্য আয়াতে আছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا * اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۔

অর্থঃ "কিছুতেই অপব্যয় করিও না, নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ আয়াত ২৬–২৭)

অপর এক আয়াতে আছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۔

অর্থঃ "এবং তাহারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাহাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।" (সূরা ফোরকানঃ আয়াত ৬৭)

মোটকথা, অপব্যয় করা কোন অবস্থাতেই কাম্য নহে। কেহ এইরূপ করিলে তাহাকে বাধা দিতে হইবে। বরং এইরূপ অপব্যয় রোধ করা কাজীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি সংসারে একা হয় এবং পরিবার পরিজন বলিতে তাহার কিছুই না থাকে তদুপরি অল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুলের শক্তিতে যদি শক্তিমান হয়, তবে তাহার পক্ষে নিজের সমস্ত সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করিয়া দেওয়া জায়েজ। ওলীমা অনুষ্ঠানের কথা এখানে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যথায় স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের পক্ষে নিজের সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ঘরের দেয়ালে নকশা করাও জায়েজ নহে। তবে যাহাদের অগাধ ধন-সম্পদ আছে, তাহাদের পক্ষে জায়েজ। কেননা, সীমার ভিতর থাকিয়া শর্তসাপেক্ষে সাজ-সজ্জা করা নিষিদ্ধ নহে। সেই আদি কাল হইতেই মসজিদের ছাদ ও প্রাচীরে কারুকার্য করা হইতেছে। অথচ নিছক সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া উহার অন্য কোন উপকারিতা নাই। বাড়ী-ঘরেরও এই হুকুম। পোশাকের শোভা ও খাদ্যের

মান বর্ধনের ক্ষেত্রেও এইরূপ কেয়াস করিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে ইহা মোবাহ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ইহার হুকুমে তারতম্য হইবে। অর্থাৎ বিত্তহীনের পক্ষে অপব্যয় এবং বিত্তবানের পক্ষে জায়েজ।

সাধারণ মুনকার

যাহারা অকর্মন্য অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকে, অর্থাৎ– মানুষকে দ্বীনের তালীম দেওয়া এবং সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি কাজ হইতে গা বাঁচাইয়া চলে তাহারাও গর্হিত কর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। গ্রাম ও বস্তি এলাকায় তো বটেই, বরং শহরের অধিকাংশ মানুষও নামাজের মাসায়েল হইতে অজ্ঞ। সুতরাং প্রতিটি মহল্লা ও শহরে এমন একজন বিজ্ঞ আলেম থাকা আবশ্যক– যিনি নিজের এলাকায় বসবাসকারী সকলকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান শিক্ষা দিবেন। অর্থাৎ যেই আলেম ফরজে আইন পালন করিবার পর ফরজে কেফায়ার উপর আমল করিতে সক্ষম, তাহার উচিৎ এলাকার জনসাধারণের নিকট গমনপূর্বক তাহাদিগকে দ্বীনের আবশ্যকীয় বিধান শিক্ষা দেওয়া। এই কাজে বাহির হওয়ার সময় নিজের পাথেয় সঙ্গে লইয়া যাইবে এবং সাধারণ মানুষের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করিবে না। কেননা, তাহাদের অধিকাংশ খাদ্য সন্দেহযুক্ত। কোন এলাকার একজন আলেমও যদি এই দায়িত্ব পালন করে তবে সেই এলাকার অপরাপর আলেমগণ এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে। অন্যথায় সকলেই অপরাধী হইবে।

আলেমগণ এই কারণে অপরাধী হইবে যে, তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত লইয়া যায় নাই। আর সাধারণ মানুষ অপরাধী হওয়ার কারণ– তাহারা দ্বীনের আহ্‌কাম বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাহা শিক্ষা করার চেষ্টা করে নাই। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহারা নামাজের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত, তাহাদের কর্তব্য– অপরাপর মানুষকে তাহা শিক্ষা দেওয়া। অন্যথায় তাহারাও অজ্ঞ মানুষদের গোনাহের অংশীদার হইবে।

এই কথা সকলেরই জানা যে, কোন মানুষই মাতৃগর্ভ হইতে আলেম হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। সুতরাং যাহাদিগকে আল্লাহ পাক এলেম দান করিয়াছেন, সেই আলেমদের কর্তব্য দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সাধারণ অজ্ঞ মানুষদের নিকট দ্বীনের বিধান পৌঁছাইয়া দেওয়া। আলেম হওয়ার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান ও সুক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইবে। বরং যেই ব্যক্তি দ্বীনের একটি মাসআলা ও একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হইবে, তাহাকে সেই বিষয়ের আলেম মনে করা হইবে। অবশ্য ইহা অন্য কথা যে, আল্লাহ পাক যাহাদিগকে দ্বীনের তাবলীগ ও তালীমের যোগ্যতা দান করিয়াছেন, সেই আলেমগণ যদি তাহাদের দায়িত্ব পালন না করে, তবে সাধারণ অজ্ঞ

মানুষদের তুলনায় সেই আলেমদের শাস্তি অধিক হইবে। কেননা, সাধারণ মানুষের নিকট আল্লাহ পাকের বিধান পৌঁছাইয়া দেওয়া– ইহা আলেমগণেরই দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সম্পাদন তাহাদের পক্ষেই সম্ভব এবং ইহা তাহাদের পেশাও বটে। কোন কর্মকার যখন তাহার কর্ম ত্যাগ করিয়া অকর্মন্য অবস্থায় বসিয়া থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাহার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তো আলেমদের উপর দ্বীনের সেই মহান কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে– যাহার উপর মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। আলেমগণের শান ও পেশা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রাপ্ত দ্বীনের তা'লীম সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর এই অর্থেই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস এবং নবীগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আমানতের হেফাজতকারী।

কোন মানুষের পক্ষে এই ওজরের কারণে ঘরে বসিয়া নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না যে, লোকেরা ভাল করিয়া নামাজ পড়ে না। বরং সাধারণ মানুষের নামাজের এই ত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তাহার কর্তব্য হইবে– ঘর হইতে বাহির হইয়া মানুষের নামাজের এছলাহ ও সংশোধনের ফিকিরে আত্মনিয়োগ করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহা ওয়াজিবও বটে।

বাজারের গর্হিত কর্মের ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ইহা জানিতে পারে যে, অমুক বাজারে সর্বদা বা নির্দিষ্ট কোন সময়ে কোন গর্হিত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, আর তাহার পক্ষে যদি ইহা দূর করার ক্ষমতাও থাকে, তবে এই ব্যক্তি ঘরে বসিয়া থাকা জায়েজ নহে। বরং বাজারে গিয়া সেই গর্হিত কর্মে বাধা দেওয়া তাহার উপর ওয়াজিব। সেই গর্হিত কর্মটি যদি পুরাপুরি দূর করা সম্ভব না হয়, তবে যেই পরিমাণ সম্ভব সেই পরিমাণই করিতে হইবে। এই গর্হিত কর্ম দূর করিতে গিয়া যদি উহার কোন কোনটি দেখিতেও হয় তবুও পিছপা হইবে না। কেননা, যেই পরিমাণ দূর করা সম্ভব সেই পরিমাণ দূর করিতে গিয়া যদি অগত্যা অবশিষ্ট গর্হিত কর্মের উপর নজর পড়ে, তবে তাহাতে কোন পাপ হইবে না।

মোটকথা, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, মানুষের এছলাহ ও সংশোধনের ফিকির করা। এই এছলাহ ও সংশোধনের আমল শুরু করিবে প্রথমে নিজের উপর। নিজের ইছলাহ হইল– পাবন্দির সহিত শরীয়তের ফরজ হুকুম সমূহের উপর আমল করা এবং সর্ব প্রকার হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকা। নিজের সংশোধনের পর সর্বপ্রথম নিজের ঘরের লোকজনের সংশোধনের

ফিকির করিবে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী, শহরবাসী, শহরের আশপাশের লোকজন অতঃপর প্রত্যন্ত-পল্লীর লোকদের এছলাহের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। সবশেষে সমগ্র দুনিয়ার যেখানেই প্রয়োজন হইবে সেখানেই গমনপূর্বক মানুষের এছলাহ ও সংশোধনের দাওয়াত দিবে। নিকটে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি এই দায়িত্ব পালন করে, তবে অনতিদূরে অবস্থানকারীর উপর হইতে এই ওয়াজিব রহিত হইয়া যাইবে। আর কেহই যদি এই দায়িত্ব পালন না করে, তবে নিকটে ও দূরে অবস্থানকারী এমন সকলকে জবাবদিহি করিতে হইবে যাহারা এই দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষও অজ্ঞ থাকিবে ততক্ষণ এই ওয়াজিব রহিত হইবে না। নিজে গমন করিয়া কিংবা অপর কাহাকেও পাঠাইয়া তাহার মাধ্যমেও এই দায়িত্ব পালন করা যাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাদশাহ ও শাসক শ্রেণীকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা

ইতিপূর্বে আমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কয়েকটি স্তর বর্ণনা করিয়াছি। যেমনঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার অন্যায় ও গর্হিত কর্ম সম্পর্কে অবহিত করা, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে নিষেধ করা, কঠোর ভাষায় বারণ করা এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে বারণ করা বা প্রয়োজনে তিরস্কার ও প্রহার করা।

বাদশাহ্ ও শাসকবর্গকে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মাধ্যমে নিষেধ করা জায়েজ। অর্থাৎ জ্ঞাত করা ও উপদেশ দেওয়া। প্রজাদের পক্ষে বল প্রয়োগের মাধ্যমে শাসক শ্রেণীকে নিষেধ করা জায়েজ নহে। কেননা, এইরূপ করিতে গেলে হিতে বিপরীত ও বিবিধ অনিষ্ট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। অবশ্য তৃতীয় স্তর তথা কঠোর ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা জায়েজ এবং মোস্তাহাব। তবে শর্ত হইল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এই বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, আমার এই আমলের কারণে অপর কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। নিজের ক্ষতি হইলে উহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই। আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত শাসক শ্রেণীকে আমরে বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার করিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিপদাপদকে কিছুমাত্র পরওয়া করেন নাই। কেননা, তাঁহারা এই কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে, আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের তাবলীগ ও নুসরত করিতে গিয়া যদি জীবনও দিতে হয়, তবে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই; কেননা, এইভাবে জীবন দিলে শাহাদাত নসীব হইবে। রাসুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام الى امام فامره و نهاه في ذات الله تعالى فقتله ·

অর্থাৎ– "শ্রেষ্ঠ শহীদ হইলেন হামজা ইবনে আব্দুল মোত্তালিব। অতঃপর সেই ব্যক্তি, যে শাসনকর্তার সামনে দাঁড়াইয়া আল্লাহর ওয়াস্তে (সৎ কাজের) আদেশ ও (অসৎ কাজের) নিষেধ করে এবং উহার কারনে শাসক তাহাকে হত্যা করে।" (হাকিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ–

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

অর্থাৎ– "শ্রেষ্ঠ জেহাদ হইল অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়াইয়া হক কথা বলা।" (আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে মাজা)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় ও সত্যের ব্যাপারে আপোষহীন ও অটল মনোভাবের কথা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন–

قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم ۰ و تركه قوله الحق ماله من صديد

অর্থাৎ– ওমর লোহার মত এমন কঠিন যে, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকের তিরস্কার তাহার উপর ক্রিয়া করে নাই। সত্য কথন তাহাকে নির্বান্ধব করিয়া দিয়াছে। (তিরমিজী, তাবরানী)

ন্যায় ও সত্যের পথে অটল বুজুর্গগণ যখন এই কথা জানিতে পারিয়াছেন যে, সর্বোত্তম কথা হইল যাহা জালেম বাদশাহর সামনে অকপটে প্রকাশ করা হয় এবং জালেম বাদশাহ যদি এই সত্য কথার অপরাধে (?) মৃত্যুদণ্ডও দেয় তবে উহার ফলে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা হাসিল হইবে; তখন তাঁহারা সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও প্রতিকুলতা উপেক্ষা করিয়া হক ও সত্য প্রকাশে ব্রতী হন। এই কাজে তাঁহারা অনুপম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক মুক্তি প্রত্যাশা করেন। আমাদের আকাবের ও বুজুর্গানেদ্বীন যেই নীতিতে বাদশাহ ও শাসক শ্রেণীকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছেন, বর্তমানেও সেই নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

নিম্নে আমরা উদাহরণ স্বরূপ এই জাতীয় কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিব। এইসব ঘটনা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গগণ নিজ নিজ যুগে জালেম ও গোমরাহ্ শাসকদিগকে কিভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিয়াছেন।

কোরাইশদের অন্যায় কাজে হযরত আবু বকরের প্রতিবাদ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) নিজে অসহায় ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কোরাইশদের অন্যায় ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা এইরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত ওরওয়া (রাঃ)।

তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট জানিতে চাহিলাম, মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান প্রতিপক্ষ কোরাইশ নেতৃবর্গ তাঁহার উপর যেই নির্যাতন চালাইয়াছে, উহার মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর ঘটনা কোন্‌টি ছিল? তিনি বলিলেন, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম, কোরাইশ নেতৃবৃন্ধ বাইতুল্লাহর হাতিমে জামায়েত হইয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে। তাহারা বলিতেছিল, আমরা মোহাম্মাদের ব্যাপারে বহু সহ্য করিয়াছি। সে আমাদের জ্ঞানীদিগকে মূর্খ বলিয়াছে, আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে গালি দিয়াছে এবং আমাদের ধর্মকে ত্রুটিযুক্ত বলিয়াছে। আমাদের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমাদের উপাস্যদের প্রতি কটুক্তি করিয়াছে। অথচ আমরা এহেন গুরুতর বিষয়ে সবর করিয়া আসিয়াছি। কোরাইশ নেতৃবর্গ এইসব আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় আগমন করিলেন এবং হজরে আসওয়াদ চুম্বন করিয়া বাইতুল্লাহর তাওয়াফ শুরু করিলেন। তাওয়াফের এক পর্যায়ে যখন হাতিমের নিকটে আসিলেন, তখন কোরাইশ দলপতিগণ এক যোগে তাঁহার উপর বিষোদ্‌গার করিতে শুরু করিল। আমি তাঁহার পবিত্র চেহারায় উহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু তিনি কোরাইশদের এই আচরণের কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে তাওয়াফ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় চক্করেও যখন তিনি কোরাইশদের নিকটে আসিলেন তখন তাহারা আগের মতই আচরণ শুরু করিল। এইবারও তিনি নীরব রহিলেন। কিন্তু তৃতীয় বারও তাহারা অনুরূপ আচরণ করিলে তিনি বলিলেন, হে কোরাইশ নেতৃবর্গ! আমি তোমাদের নিকট মৃত্যুর পয়গাম লইয়া আসিয়াছি (অর্থাৎ- ইসলাম তোমাদের নিকট মৃত্যুর মতই অসহনীয়)। এই কথা শুনিবার পর তাহারা মস্তক অবনত করিয়া এমনভাবে নীরব হইয়া গেল যেন তাহাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাহারা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কাজে তৎপর ছিল, এক্ষণে সেই কোরাইশরাই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, হে আবুল কাসেম! আপনি নিরাপদে প্রস্থান করুন। আল্লাহর কসম! আপনি মূর্খ নহেন।

পরদিন পুনরায় তাহারা হাতিমে জড়ো হইয়া আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। এই সময় আমি তাহাদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাহাদের মধ্য হইতে একজন অপরজনকে বলিল, তোমাদের কি স্মরণ আছে, গতকাল তিনি আমাদিগকে কি

দিয়াছেন আর আমরা তাহাকে কি দিয়াছি? তিনি এমনসব কথা বলিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট অপছন্দনীয়। উহার পরও আমরা তাহাকে নিরাপদে ছাড়িয়া দিয়াছি।

মোটকথা, তাহাদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা চলিতেছিল। এমন সময় বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক যোগে লাফাইয়া উঠিয়া আল্লাহর নবীকে ঘিরিয়া ফেলিল। অতঃপর জনৈক কোরাইশ নেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমাদের দেবতাকে খারাপ বল এবং আমাদের ধর্মের নিন্দা কর? আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীর-শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ হাঁ, আমি এইরূপই বলি। এই জবাব শুনিয়া তাহারা আরো ক্ষেপিয়া উঠিল এবং এক ব্যক্তি তাঁহার গায়ের চাদর ধরিয়া হেঁচকা টান দিয়া তাঁহাকে হেঁচড়াইতে লাগিল। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া তিনি হায় হায় করিয়া উঠিলেন এবং সহসা কোরাইশ সরদারগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে হতভাগার দল! তোমাদের বিনাশ হউক। তোমরা কি তাঁহাকে এই কারণে মারিয়া ফেলিবে যে, তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ? কোরাইশ সরদারগণ হযরত আবু বকরের মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আর কখনো কোরাইশরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতকষ্ট দিতে আমি দেখি নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের অপর এক রেওয়াতে উপরোক্ত ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে; একদিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর চত্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে মুঈত তথায় আসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিল। অতঃপর নিজের চাদরটি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলায় জড়াইয়া তাঁহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিল। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বাইতুল্লাহর আঙ্গিনায় আগমন করিলেন এবং এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া ওকবার কবল হইতে আল্লাহর নবীকে উদ্ধার করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন–

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ– "তোমরা কি একজনকে এইজন্যে হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ। অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছে।" (সূরা মোমিনঃ আয়াত ২৮)

হযরত আবু মুসলিম খাওলানীর ঘটনা

একবার হযরত আমীর মোয়াবিয়া কি কারণে মুসলমানদের ভাতা বন্ধ করিয়া দেন। এই ঘটনার পর একদিন তিনি খোৎবা দিতে শুরু করিলে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে মোয়াবিয়া! যেই সমস্ত সম্পদ তুমি আটকাইয়া রাখিয়াছ, সেইগুলি না তোমার পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার পিতা বা মাতার পরিশ্রম লব্ধ। খাওলানীর এই বক্তব্য শুনিয়া আমীর মোয়াবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া আসিলেন এবং উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ স্থানে বসিয়া থাকিতে বলিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পর তিনি গোসল করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলিয়াছে যে, উহার ফলে আমার মনে ভিষণ রাগ ধরিয়া যায়। আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই এরশাদ শুনিয়াছি–

الغضب من الشيطان و الشيطان خلق من النار ۰ و انما تطفأ النار بالماء

فاذا غضب احدكم فليغتسل

অর্থাৎ– "ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে এবং শয়তান আগুন দ্বারা সৃজিত। আর আগুন পানি দ্বারা নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কাহারো ক্রোধ হইলে সে যেন গোসল করিয়া লয়।"

এই কারণেই ক্রুদ্ধ হওয়ার পর আমি ভিতরে গিয়া গোসল করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি আবু মুসলিমকে বলিতেছি, সে যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য। এই সম্পদ আমার শ্রমলব্ধ নহে এবং আমার পিতামাতার শ্রমলব্ধও নহে। সুতরাং তোমরা আসিয়া তোমাদের ভাতা লইয়া যাও।

জাব্বা ইবনে মুহসিনের প্রতিবাদ

জাব্বা ইবনে মুহসিন (রহঃ) বলেন, বসরায় আমাদের গভর্ণর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁহার নিয়ম ছিল, খোৎবা প্রদানের সূচনাতে তিনি হামদ ও ছানার পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর জন্য দোয়া করিতেন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের কথা স্মরণ করিতেন না। তাঁহার এই আচরণটি আমার নিকট ভাল লাগে নাই। সেমতে একদিন তিনি খোৎবা দিতে শুরু করিলে আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম, বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি হযরত ওমর ফারূককে (রাঃ) হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের (রাঃ) উপর প্রাধান্য দিতেছেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন ছাহেবে রাসূল এবং মুসলমানদের প্রথম

খলীফা। অথচ খোৎবায় আপনি হযরত ওমরের (রাঃ) জন্য দোয়া করেন কিন্তু হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের কথা স্মরণ করেন না।

কয়েক জুমুআ পর্যন্ত তিনি এইরূপই করিলেন। পরে আমীরুল মোমেনীন খলীফা হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট আমার নামে অভিযোগ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, জাব্বা ইবনে মুহসিন আমার খোৎবায় বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে খলীফা হুকুম পাঠাইলেন, "জাব্বাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

খলীফার নির্দেশ পাইয়া আমি বসরা হইতে রওনা হইয়া মদীনায় পৌছাইলাম। এই সময় আমীরুল মোমেনীন গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি দরজায় আওয়াজ দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি জাব্বা ইবনে মুহসিন, বসরা হইতে আসিতেছি। তিনি বলিলেন, তুমি তো 'মারহাবা' কিংবা 'আহলান' (অর্থাৎ– এমন বাক্য যাহা পরস্পর সাক্ষাতের সময় বলা হয়) ইত্যাদি কিছুই বলিলে না। আমি বলিলাম, মারহাবা হইল আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে। আর আহলান হইল পরিবার পরিজন। কিন্তু আমি তো একা। আমার পরিবার-পরিজন বা ধন-সম্পদ বলিতে কিছুই নাই। এখন আপনি বলুন, কি কারণে আমাকে এত দূর হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন এবং কোন্ কারণেই বা আমাকে এই শাস্তি দেওয়া হইল। জবাবে তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আবু মূসা আশআরীর ও তোমার মাঝে বিরোধের কারণটা কি? আমি উহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) খোৎবায় আল্লাহ পাকের হামদ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পর আপনার জন্য দোয়া করেন। এই বিষয়টি আমার নিকট দৃষ্টিকটু মনে হইয়াছে যে, তিনি আপনাকে হযরত আবু বকর ছিদ্দিকের উপর প্রাধান্য দিতেছেন। এই বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেই তিনি আপনার নিকট আমার নামে অভিযোগ করিয়াছেন। আমার এই বক্তব্য শুনিয়া হযরত ওমর ফারূক অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার তুলনায় অধিক তওফীক প্রাপ্ত ও হেদায়েত প্রাপ্ত। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে আরজ করিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর একটি রাত ও একটি দিন ওমর ও ওমরের গোটা বংশধর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি কি তোমার নিকট উহার কারণ বর্ণনা করিব? আমি সম্মত হইলে তিনি বলিলেন–

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর যেই রাতটি শ্রেষ্ঠ তাহা হইল–

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাফেরদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে মক্কা নগরী ত্যাগ করিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হন, তখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) তাহার সঙ্গে ছিলেন। পথিমধ্যে কখনো তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগ্রে, কখনো পশ্চাতে আবার কখনো ডানে ও বামে চলিতেছিলেন। তাঁহার এই অস্থিরতা দেখিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর! তুমি এমন করিতেছ কেন? তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার যখন আশংকা হয় যে, শত্রু হয়ত আপনার সম্মুখ দিকে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, তখন আমি আপনার অগ্রে চলিয়া আসি। আবার যখন আশংকা হয়, কেহ হয়ত আপনাকে ধাওয়া করিয়া আসিতেছে, তখন আমি আপনার পিছনে চলিয়া যাই। ডান দিক ও বাম দিক হইতে আক্রমণের আশংকার ক্ষেত্রেও সেই দিকে চলিয়া যাই। মোটকথা, আপনার নিরাপত্তার আশংকায় আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

শত্রুপক্ষ যেন তাঁহাদের উপস্থিতি টের না পায় এই উদ্দেশ্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছিলেন। ফলে তাঁহার আঙ্গুল মোবারক যখম হইয়া যায়। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এই অবস্থা দেখিয়া পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর হাঁটিতে দিলেন না এবং তাঁহাকে নিজের কাঁধে তুলিয়া সওর পাহাড়ের একটি গুহার নিকট লইয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মহান জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি এই গুহার অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া আসার পূর্বে আপনি ইহাতে প্রবেশ করিবেন না। কেননা, গুহার ভিতর যদি কোন কষ্টদায়ক প্রাণী থাকে তবে উহা দ্বারা যেন আমিই কষ্ট পাই এবং আপনি নিরাপদ থাকেন। অতঃপর তিনি গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হইলেন যে, গুহার ভিতর কোন ক্ষতিকর প্রাণী নাই, তখন তিনি প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিতরে লইয়া আসিলেন। পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার এক স্থানে একটি গর্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি আশংকা করিলেন, হয়ত উহা হইতে কোন সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি বাহির হইয়া আল্লাহর নবীকে কষ্ট দিতে পারে। অতঃপর তিনি নিজের পা দ্বারা সেই গর্তটির মুখ চাপা দিয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর গর্তের ভিতর হইতে একটি সাপ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে দংশন করিল। বিষের তীব্র যন্ত্রণায় এক পর্যায়ে তাঁহার চোখ হইতে পানি বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তবুও তিনি গর্তের মুখ হইতে পা সরাইলেন না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-কে কাঁদিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু বকর! لا تحزن ان الله معنا চিন্তা

করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অন্তরে সকুন ও সান্ত্বনা নাজিল করিলেন এবং অবশিষ্ট রাত তাঁহারা নির্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, এই হইল হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ রজনীর ঘটনা। এক্ষণে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দিবসের ঘটনা শোন–

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আরবের কোন কোন সম্প্রদায় মোরতাদ হইয়া গেল। আবার কেহ কেহ ঘোষণা দিল– আমরা নামাজ পড়িব বটে, কিন্তু জাকাত আদায় করিব না। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমি এমন নাজুক পরিস্থিতিতে জেহাদ করার পক্ষে ছিলাম না। সুতরাং পরিস্থিতির প্রতিকুলতার কারণে তাঁহাকে জেহাদ হইতে নিবৃত্ত করার জন্য আমি তাঁহার খেদমতে গিয়া আরজ করিলাম, আয় নায়েবে রাসূল! আপনি বরং মানুষের নিকট গিয়া নরমভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করুন। আমার বক্তব্য শুনিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, ওমর! আমাকে তুমি অবাক করিলে বটে। ইসলামের পূর্বে তুমি তো বেশ মজবুত ছিলে। আর ইসলামে আসিয়া তুমি এমন নরম হইয়া গেলে? আমি তাহাদের নিকট কি কারণে যাইব বল ? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ওহীর আগমন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহারা যদি আমাকে এমন একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে– যাহা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিত, তবে আমি তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব।

যাহাই হউক, পরে আমরা তাহার সঙ্গে থাকিয়া বিদ্রোহী দলসমূহের বিরুদ্ধে জেহাদ করিলাম। এখন আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সেই দিন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ও সময়পোযোগী ছিল। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

হযরত আতা ইবনে রূবাহ্ কর্তৃক খলীফাকে নসীহত

আসমায়ী বলেন, খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান নিজের শাসনামলে একবার হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। সেই সময় এক দিন তাহার দরবারে মক্কা ও মক্কার আশপাশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আতা ইবনে রূবাহ্ খলীফার দরবারে আগমন করেন। খলীফা সম্মানে দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং নিজের একান্ত নিকটে তাহাকে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। হযরত আতা আসন গ্রহণ করিবার পর খলীফা অত্যন্ত আদবের সহিত তাহার

সম্মুখে বসিয়া আরজ করিলেন, হে আবু মোহাম্মদ! আপনি কি উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনিয়াছেন? হযরত আতা বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি আল্লাহ পাকের হেরেম ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেরেমের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহকে ভয় করুন। হারামাঈনের অধিবাসীদের খোঁজ-খবর রাখুন এবং মুহাজির ও আনসারদের বংশধরদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা, তাহাদের কারণেই আপনি খেলাফতের মসনদে আসীন হইতে পারিয়াছেন। যেই সকল মুজাহিদ সীমান্ত প্রহরা ও মুসলমানদের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত, তাহাদের ব্যাপারেও আল্লাহকে ভয় করিতে ভুলিবেন না। সাধারণ মুসলমানদের নাগরিক সুবিধা এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর রাখিবেন। কেননা, তাহাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে আপনাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য কখনো আপনার মহলের দরজা বন্ধ করিবেন না এবং তাহাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

হযরত আতা ইবনে রূবাহ'র উপরোক্ত নসীহতের পর খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান আরজ করিলেন, আপনার নসীহত উত্তম ও যথার্থ। আমি আপনার কথামতই কাজ করিব। অতঃপর হযরত আতা প্রস্থানোদ্যত হইলে খলীফা তাহার খেদমতে আরজ করিলেন, হে আবু মোহাম্মদ! এতক্ষণ তো আপনি কেবল মানুষের কথা বলিলেন, এইবার আপনার নিজের কথা এবং নিজের কিছু প্রয়োজনের কথা বলুন। হযরত আতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, মানুষের নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই– এই কথা বলিয়াই তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর খলীফা মন্তব্য করিলেন, ইহারই নাম মহত্ত্ব ও বুজুর্গী।

হযরত আতার আরেকটি ঘটনা

কথিত আছে যে, একবার খলীফা ওলীদ ইবনে মালেক তাহার দারোয়ানকে বলিলেন, তুমি প্রধান ফটকে দাঁড়াইয়া থাক। এই পথে কেহ গেলে তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে, আমি তাহার নিকট হইতে গল্প শুনিব। দারোয়ান খলীফার নির্দেশমত ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সেই পথে হযরত আতা ইবনে রূবাহ কোথায় যাইতেছিলেন। দারোয়ান তাহার পথ রোধ করিয়া বলিল, বড় মিয়া! আপনি আমীরুল মোমেনীনের নিকট চলুন, ইহা তাহার নির্দেশ। হযরত আতা নির্বিবাদে দারোয়ানের সঙ্গে গিয়া খলীফার মহলে হাজির হইলেন। সেখানে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আতা খলীফা ওলীদ ইবনে মালেককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছালামু আলাইকুম হে ওলীদ! ছালামের জবাব দানের পর খলীফা দারোয়ানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হতভাগা! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম এমন একজন

মানুষকে আনিয়া হাজির করিতে, যে আমাকে কিস্‌সা-কাহিনী শোনাইবে। আর তুমি কিনা এমন একজনকে নিয়া আসিয়াছ, যিনি আমাকে সেই নামে ডাকাও পছন্দ করেন না, যাহা আল্লাহ পাক আমার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। (অর্থাৎ "আমীরুল মোমেনীন")। দারোয়ান আরজ করিল, এই ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ তো সেই পথে আসে নাই। অতঃপর খলীফা হযরত আতার খেদমতে আরজ করিলেন, আপনি আসন গ্রহণ করুন এবং আমাকে কিছু কথা শোনাইয়া যান। হযরত আতা সংক্ষেপে একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হাবহাব। আল্লাহ পাক উহা এমন শাসনকর্তাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন যাহারা নিজ প্রজাদের উপর জুলুম করে।

এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে খলীফা ওলীদ ভয়ানক চিৎকার দিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ হযরত আতাকে বলিলেন, আপনি খলীফাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। হযরত আতা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে ওমর! প্রকৃত অবস্থা এইরূপই, প্রকৃত অবস্থা এইরূপই।

মালেক ইবনে মারওয়ানকে নসীহত

ইবনে আবী শোমায়লা ছিলেন একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। একবার তিনি খলীফা মালেক ইবনে মারওয়ানের নিকট গেলে খলীফা তাহাকে কিছু বলার অনুরোধ করিলেন। শোমায়লা বলিলেন, আমি কি বলিব! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ব্যতীত আর যাহা কিছুই বলা হইবে উহাই বক্তার জন্য অকল্যাণ ডাকিয়া আনিবে এবং এই কারণে তাহাকে জবাবদিহিও করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া খলীফা কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, মানুষ তো সর্দাসর্বদা একে অপরকে নসীহত করিয়া আসিতেছে (সুতরাং আপনিও আমাকে নসীহত করুন)।

এইবার শোমায়েল বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, কেয়ামতের অশান্তি ও তিক্ততা হইতে এমন লোকেরাই মুক্তি পাইবে, যাহারা নিজের নফসকে অসন্তুষ্ট করিয়া আল্লাহকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। খলীফা আব্দুল মালেক পূর্বাধিক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, আপনার এই মূল্যবান নসীহত আমার সারা জীবন স্মরণ থাকিবে।

হাজ্জাজের সম্মুখে

ইবনে আয়েশা বলেন, একবার হাজ্জাজ বসরা ও কুফা নগরীর আলেম ও ফকীহগণকে ডাকাইলে আমরা সকলে গিয়া তাহার দরবারে হাজির হইলাম। হযরত হাসান বসরী সকলের পরে আগমন করিলেন। হাজ্জাজ অত্যন্ত ইজ্জতের

সহিত তাহাকে নিকটে বসাইলেন। অতঃপর আলোচনা শুরু হইল। আমরা হাজ্জাজের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিলাম। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রসঙ্গ উঠিলে হাজ্জাজ তাঁহার শানে অকথ্য ভাষায় কটুক্তি করিতে লাগিল। আমরা তখন হাজ্জাজের ভয়ে ভীত ছিলাম এবং হাজ্জাজের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। এদিকে হযরত হাসান বসরী তখন নীরবে বসা ছিলেন। হাজ্জাজ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আবু সাঈদ! আপনি নীরবে বসিয়া আছেন কেন? আপনিও কিছু বলুন। হযরত হাসান প্রথমে কিছু বলিতে চাহিলেন না। কিন্তু হাজ্জাজ পুনরায় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আপনি আলী সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। এইবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ পাকের এই এরশাদ শুনিয়াছি–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ط وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ *

অর্থঃ "আপনি যেই কেবলার উপর ছিলেন, উহাকে আমি এই জন্য কেবলা করিয়াছিলাম, যাহাতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই ইহা কঠোরতর বিষয়। কিন্তু তাহাদের জন্য নহে যাহাদিগকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ এমন নহেন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।" (সূরা আলবাকারাঃ আয়াত ১৪৩)

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট মতামত হইলঃ তিনি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য যাহাদিগকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের নূর দান করিয়াছেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একাধারে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই এবং তাঁহার জামাতা। তিনি পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহার যেই সব ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার সকল কিছুই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন তোমার পক্ষে কিংবা অপর কাহারো পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, তাঁহার সেইসব শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজুর্গী মুছিয়া ফেলিবে কিংবা তাঁহার ও সেইসবের মাঝে অন্তরায় হইবে। হযরত আলী (রাঃ) যদি কোন অন্যায় করিয়াও থাকেন, তবে আল্লাহ পাকই উহার হিসাব লইবেন– আমরা এই বিষয়ে নাক গলাইবার কে?

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে হাসান বসরীর উপরোক্ত মতামত শুনিয়া হাজ্জাজ রোষানলে জ্বলিয়া উঠিল এবং অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে সিংহাসন

হইতে নামিয়া শাহী মহলের একটি কক্ষে চলিয়া গেল। এই সময় আমরা তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

এদিকে আমের শা'বী বলেন, হাজ্জাজ ভিতরে চলিয়া যাওয়ার পর আমি হযরত হাসান বসরীর হাত ধরিয়া বলিলাম, আপনি তো হাজ্জাজকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন এবং তাহার অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছেন। জবাবে তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমের! তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও। মানুষ বলে, আমের শা'বী কুফার একজন বড় আলেম। কিন্তু আমি বলি, এলেমের সঙ্গে তোমার দূরতম কোন সম্পর্কও নাই। তুমি একজন মানবরূপী শয়তানের সঙ্গে তাহার মর্জি অনুযায়ী কথা বল এবং তাহার মতামতে সায় প্রদান কর। ইহা খুবই যঘন্য কাজ। তুমি আল্লাহর ভয়কে উপেক্ষা করিয়া হাজ্জাজের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাহার প্রশ্নের জবাব দিয়াছ। তাহার প্রশ্নের জবাবে সত্য প্রকাশের হিম্মত না থাকিলে তুমি নীরব থাকিতে পারিতে। আমের শা'বী বলিলেন, আমি যদিও হাজ্জাজের অনুকূলে জবাব দিয়াছি, কিন্তু আমার অপরাধ সম্পর্কে বরাবরই আমার অনুভূতি ছিল। হযরত হাসান বলিলেন, ইহা তো আরো যঘন্য অপরাধ যে, তুমি জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা বলিতেছিলে।

আমের শা'বী বলেন, হাজ্জাজ অতঃপর হযরত হাসান বসরীকে সম্মুখে ডাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, যেই সমস্ত শাসক ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করে, আপনি কি তাহাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করেন এবং জনসম্মুখে তাহাদের নিন্দাও করেন? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, আমি এইরূপই করি বটে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কারণ কি? হযরত হাসান বলিলেন, উহার কারণ হইল, আল্লাহ পাক আলেমদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইয়াছেন যে, তাহারা যেন মানুষের নিকট বর্ণনা করে এবং এলেম গোপন না করে। এরশাদ হইয়াছে–

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُوْنَهٗ

অর্থঃ "আর আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন যে, তাহা মানুষের নিকট বর্ণনা করিবে এবং গোপন করিবে না।"

(সূরা আলে এমরানঃ আয়াত ১৮৭)

হযরত হাসানের বক্তব্য শুনিয়া হাজ্জাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর হযরত হাসানকে কঠোর ভাষায় শাসাইয়া বলিল, ভবিষ্যতে আর কখনো যদি আপনার মুখে এইরূপ কথা শুনি, তবে আপনার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

অপর এক ঘটনার প্রকাশ– একবার হাতীত জাইয়াতকে হাজ্জাজের দরবারে হাজির করা হইলে হাজ্জাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিই কি হাতীত? তিনি বলিলেনঃ হাঁ, আমিই হাতীত। আপনার যাহা মনে চায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি মাকামে ইবরাহীমে আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে তিনটি অঙ্গীকার করিয়াছি। প্রথমতঃ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইলে আমি সত্য জবাব দিব। দ্বিতীয়তঃ বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করিব। তৃতীয়তঃ নিরাপদ থাকিলে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করিব। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? জবাবে তিনি বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা হইল আপনি জমিনের উপর আল্লাহর দুশমন। আপনি আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন এবং অকারণে মানুষকে হত্যা করেন। হাজ্জাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমীরুল মোমেনীন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বলিলেন, আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান আপনার চাইতেও যঘন্য। তাহার অপকর্মের কোন অন্ত নাই। ইবনে মারওয়ানের অন্যতম অপরাধ হইল আপনার অস্তিত্ব।

হাতীত জাইয়াতের এই স্পষ্ট ভাষণে হাজ্জাজ ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিল এবং জল্লাদকে হুকুম দিল, যেন তাহাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। অতঃপর তাহার দেহে বাঁশের শলাকা বিদ্ধ করিয়া মাটিতে হেঁচড়ানো হইল। ফলে তাহার দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে গোশত বিচ্ছিন্ন হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু এই কঠিন শাস্তির পরও তিনি উহ্ শব্দটি পর্যন্ত করিলেন না। এমনকি শাস্তি মওকুফের জন্য হাজ্জাজের নিকট ক্ষমাও চাহিলেন না এবং নিজের কষ্টের কথাও প্রকাশ করিলেন না। এক পর্যায়ে জল্লাদ হাজ্জাজকে জানাইল, অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার পর এখন সে মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছে। হাজ্জাজ হুকুম দিল, এইবার তাহাকে সড়কের উপর নিয়া ফেলিয়া রাখ, যেন সাধারণ মানুষ তাহার পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

জাফর বলেন, আমি এবং হাতীতের এক সুহৃদ তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হাতীত! তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? সে পানি চাহিলে আমরা তাহাকে পানি আনিয়া দিলাম। পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে সে দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল। এই সময় তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র আঠার বৎসর।

বাদশাহকে উপদেশ দানে হযরত হাসান বসরীর অনুপম দৃষ্টান্ত

আমর ইবনে হুবায়রা ছিলেন ইরাকের গভর্ণর। একবার তিনি বসরা, কুফা, সিরিয়া ও মদীনার ফকীহ ও আলেমগণকে একত্রিত করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তাহার ধারণা হইল, উপস্থিত আলেমগণের মধ্যে আমের শা'বী ও হাসান বসরী সকলের শীর্ষে। অতঃপর তিনি সকলকে বিদায় করিয়া এই দুইজনের সঙ্গে একান্তে আলোচনায় বসিলেন। প্রথমে তিনি আমের শা'বীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আবু আমর! আমি আমীরুল মোমেনীনের পক্ষ হইতে ইরাকের গভর্ণর। আমি তাহার একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং তাহার আনুগত্যে আদিষ্ট। জনগণের হেফাজত এবং তাহাদের রক্ষাণাবেক্ষণ আমার অন্যতম দায়িত্ব। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আমি আন্তরিক ও সচেতন। আমি জনগণের পরম হিতাকাংখী এবং তাহাদের কল্যাণের জন্য অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এতসব কিছুর পরও তাহাদের কোন কোন আচরণে আমার মনে রাগ আসে এবং আমি তাহাদের ভাতা মওকুফ করিয়া তাহা বাইতুল মালে রাখিয়া দেই। অবশ্য আমার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে বাইতুল মাল হইতে বঞ্চিত করা নহে; বরং আমার উদ্দেশ্য– তাহারা নিজেদের অপরাধ উপলব্ধি করিয়া অনুতপ্ত হইলেই আমি সেই ভাতা ফিরাইয়া দিব। কিন্তু আমীরুল মোমেনীন এজীদ যখন জানিতে পারেন যে, আমি অমুকের ভাতা মওকুফ করিয়া দিয়াছি তখন তিনি আমার নিকট নির্দেশ পাঠান, যেন সেই ভাতা আর ফেরৎ দেওয়া না হয়। এখন আমার সম্মুখে দোটানা অবস্থা। অর্থাৎ আমীরের হুকুম পালন করিইবা কেমন করিয়া এবং জনগণকেইবা তাহাদের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করি কিভাবে? এই ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত, আর কি না করা উচিৎ তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। এই বিষয়ে আমি আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ চাহিতেছি।

গভর্ণরের উপরোক্ত সমস্যার জবাবে শা'বী বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে নেকী দান করুন। বাদশাহ পিতৃতুল্য। তিনি ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার কাজই করিতে পারেন (সুতরাং এই বিষয়ে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নাই। আপনার কর্তব্য– বাদশাহর আনুগত্য করিয়া যাওয়া)।

এই জবাবে গভর্ণর ইবনে হুবায়রা প্রীত হইয়া বলিলেন, আল্লাহ পাকের শোকর যে, আমাকে কোনরূপ জবাবদিহি করিতে হইবে না। অতঃপর তিনি

হযরত হাসান বসরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হে আবু সাঈদ! এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হযরত হাসান বসরী বলিলেন, আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি আমীরুল মোমেনীনের নায়েব, তাহার বিশ্বস্ত এবং তাহার আনুগত্যে আদিষ্ট। সেই সঙ্গে প্রজাসাধারনের সর্ববিধ মঙ্গল সাধন এবং তাহাদের হক সমূহের হেফাজত করাও আপনার কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক, জনগণের হক আদায় করা আপনার অন্যতম কর্তব্য এবং তাহাদের হিত কামনা আপনার উপর ওয়াজিব। আমি আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা কারাশী ছাহাবী হইতে এই হাদীছ শুনিয়াছি–

من استرعي رعية فلم يحطها النصيحة حرم الله عليه الجنة

অর্থাৎ– "যেই ব্যক্তি প্রজাদের শাসক হইয়া হিতকামনার সহিত তাহাদের হেফাজত করে না, আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।"

আপনি আরো বলিয়াছেন, কখনো কখনো আপনি প্রজাদের ভাতা বন্ধ করিয়া দেন যেন তাহারা নিজেদের ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া আত্মসংশোধন করিতে পারে। কিন্তু আমীরুল মোমেনীন এজীদ যখন জানিতে পারেন যে, আমি কতক মানুষের ভাতা বন্ধ করিয়া দিয়াছি, তখন তিনি আমাকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠান যেন তাহা আর ফেরৎ দেওয়া না হয়। এই ক্ষেত্রে আপনি যেমন আমীরুল মোমেনীনের হুকুম অমান্য করিতে পারেন না, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকেওবা কেমন করিয়া তাহাদের ভাতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে তাহাও ভাবিয়া পান না।

আপনার এই সমস্যার প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব– আমীরুল মোমেনীন যখনই আপনার উপর কোন হুকুম জারী করিবেন তখনই আপনি তাহা যাচাই করিয়া দেখিবেন যে, তাহা আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুকূল কি-না। অর্থাৎ আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহর হুকুমের অনুকূল হয়, তবে নির্দ্বিধায় তাহা পালন করিবেন। পক্ষান্তরে আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে অবশ্যই তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। হে ইবনে হুবায়রা! আমি আপনার একজন হিতাকাংখী হিসাবে আপনাকে পরামর্শ দিতেছি–

আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর দূত শীঘ্রই আপনার নিকট আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। সে আপনাকে শাহী তখত্ হইতে নামাইয়া দিবে এবং আপনাকে এই জৌলুসপূর্ণ প্রাসাদ হইতে বহিষ্কার করিয়া সংকীর্ণ কবরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পৌঁছাইয়া দিবে। সেই কঠিন দিনে আপনার আজিকার এই

রাজক্ষমতা ও ধনসম্পদ কিছুমাত্র কাজে আসিবে না। সকল কিছু পিছনে ফেলিয়া আপনাকে একেবারে শূন্য হাতে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হইতে হইবে। সেই দিন কেবল আপনার নেক আমলই আপনার সহযোগী হইবে।

হে ইবনে হুবায়রা! আপনি এজীদকে ভয় করিতেছেন? আল্লাহ্ পাক আপনাকে এজীদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু এজীদের সাধ্য কি সে আপনাকে আল্লাহ্‌র আজাব হইতে রক্ষা করে? আল্লাহ্‌র আদেশ সকল আদেশের উর্ধ্বে এবং তাঁহার মর্জি সকল মর্জির উর্ধ্বে। আমি আপনাকে এমন আজাব হইতে সতর্ক করিতেছি, যাহা অপরাধীদের উপর অবশ্য নাজিল হইবে।

হযরত হাসান বসরী উপরোক্ত স্পষ্ট ভাষণে ইবনে হুবায়রা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে শায়খ! আপনি ক্ষান্ত হউন এবং আমীরুল মোমেনীনের ব্যাপারে আপনার মতামত প্রত্যাহার করুন। কেননা, তিনিও একজন আলেম, মুসলমানদের শাসক এবং একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তাহার মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা আছে বলিয়াই আল্লাহ্ পাক তাহাকে মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরীর বলিলেন, হে ইবনে হুবায়রা! হিসাব-কিতাবের পর্যায়টি সামনে আসিতেছে। আল্লাহ্ পাক অপেক্ষা করিতেছেন। যথাসময় হক-নাহকের ফয়সালা হইবে এবং সেই দিন বেত্রের বদলে বেত্র ও গজবের বদলা গজব দ্বারাই হইবে। আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, যেই ব্যক্তি আপনাকে সৎ উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে, সে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে।

মোটকথা, হযরত হাসান বসরীর এইসব তিক্ত কথা গভর্ণর ইবনে হুবায়রার মনপূত হইল না এবং এক পর্যায়ে সে আলোচনা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়া গেল। এই সময় শা'বী হযরত হাসানকে বলিলেন, হে আবু সাঈদ! আপনি তো অকারণে ইবনে হুবায়রাকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন এবং তাহার পক্ষ হইতে আমাদের যাহা পাওয়ার আশা ছিল উহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম। আমার এই কথায় হযরত হাসান আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, শা'বী! তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও এবং আর কখনো এইরূপ কথা বলিও না।

আমের শা'বী বলেন, উপরোক্ত ঘটনার পর হযরত হাসান বসরীর নিকট গভর্ণর হুবায়রার পক্ষ হইতে মূল্যবান উপঢৌকন আসিল এবং তাহার সম্মান বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু আমি এই সবের কিছুই পাইলাম না এবং গভর্ণরের সুনজর হইতেও বঞ্চিত হইলাম। বাস্তবিক হযরত হাসান বসরীর প্রতি যেই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তিনি উহার উপযুক্ত ছিলেন। আর আমাকে যেই অবজ্ঞা

করা হইল আমি উহারই উপযুক্ত ছিলাম। আমি হযরত হাসান বসরীর মত এমন আস্থাভাজন ও প্রাজ্ঞ আলেম আর দেখি নাই। আলেমদের সমাবেশে সর্বদাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী হইয়াছেন। তিনি কথা বলিতেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আর আমরা কথা বলিতাম শাসক শ্রেণীকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পর আমি আল্লাহ পাকের নিকট ওয়াদা করিলাম– কোন শাসককে খুশী করার জন্য আর কোন দিন তাহাদের শরণাপন্ন হইব না।

খলীফা মনসুরকে নসীহত

হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমার পিতৃব্য মোহাম্মদ ইবনে আলী বলিয়াছেন, একবার আমি খলীফা আবু জাফর মনসুরের দরবারে গেলাম। সেখানে ইবনে আবী জুআইব এবং মদীনার গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদও উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে গেফার গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল উপস্থিত হইল। তাহারা খলীফার নিকট মদীনার গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদের বিরুদ্ধে কতক অভিযোগ উত্থাপন করিল। খলীফা এই বিষয়ে ইবনে জায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিলেন, অভিযোগকারীগণ কেমন লোক এই বিষয়ে আপনি ইবনে আবী জুআইবকে জিজ্ঞাসা করুন। সেমতে খলীফা ইবনে আবী জুআইবকে অভিযোগকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, ইহারা মানুষকে অপমান করে এবং অকারণে মানুষকে কষ্ট দেয়। খলীফা গেফারীগণকে বলিলেন, তোমাদের ব্যাপারে কি বলা হইল তাহা শুনিতে পাইলে তো? তাহারা বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি তাহার নিকট ইবনে জায়েদ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করুন। খলীফা ইবনে জায়েদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, ইবনে জায়েদ অন্যায়ভাবে ফায়সালা করেন। খলীফা ইবনে জায়েদকে বলিলেন, তোমার সম্পর্কে আবী জুআইবের রায় শুনিতে পাইলে? সে নেক মানুষ তাহার রায় অমূলক হইতে পারে না। গভর্ণর হাসান ইবনে জায়েদ বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আবী জুআইবের নিকট আপনার নিজের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করুন। এইবার খলীফা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এই বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু খলীফা আল্লাহর নামের কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলে অগত্যা তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আহরণ করিয়াছেন এবং এমন লোকদের পিছনে তাহা ব্যয় করিয়াছেন যাহারা উহার হকদার নহে। আমি ইহাও সাক্ষ্য দেই যে, আপনার ঘর হইতেই জুলুমের উৎপত্তি হইতেছে। এই কথা শুনিয়া খলীফা নিজের আসন ছাড়িয়া ইবনে আবী জুআইবের নিকট আসিলেন

এবং তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এই স্থানে না বসিতাম, তবে রোম, পারস্য ও তুর্কিগণ তোমাদের নিকট হইতে এই আসন ছিনাইয়া লইত। কিন্তু ইবনে আবী জুআইব খলীফার এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনার পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-ও খেলাফতের আসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা ন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রাপকদের মাঝে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। অথচ সেই যুগে রোম ও পারসিকদের মস্তক তাহাদের করতলগত ছিল। এই কথা শুনিয়া খলীফা মনসুর তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি এই কথা না জানিতাম যে, আপনি সত্য কথা বলেন, তবে আজ আপনাকে অবশ্যই হত্যা করিতাম। ইবনে আবী জুআইব আল্লাহর নামের শপথ করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনার পুত্র মাহদীর চাইতেও আপনার অধিক হিতাকাংখী। এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইবনে আবী জুআইব খলীফার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হইল। হযরত সুফিয়ান তাহাকে বলিলেন, আপনি ঐ জালেমের সঙ্গে যেইভাবে কথা বলিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। কিন্তু আপনার একটি কথা আমার নিকট খারাপ লাগিয়াছে যে, আপনি তাহার পুত্রকে মাহদী (হেদায়েতপ্রাপ্ত) বলিয়াছেন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইবনে আবী জুআইব বলিলেন, আমি তাহাকে সেই অর্থে মাহদী বলি নাই।

অনুরূপ অপর ঘটনা

আব্দুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী বর্ণনা করেন, একবার আমি সমুদ্র উপকূলে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময় খলীফা আবু জাফর মনসূর আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যথা সময় দরবারে হাজির হইয়া তাহাকে ছালাম করিলাম। ছালামের জবাব দানের পর তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এতদিন আসেন নাই কেন? আমি তাহার এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছেন, বলুন। তিনি বলিলেন, আমি আপনার সদুপদেশ দ্বারা উপকৃত হইতে চাই। আমি বলিলাম, আপনি যদি আমাকে এই উদ্দেশ্যেই আহবান করিয়া থাকেন, তবে আমি আপনাকে কিছু নসীহত করিব। আপনি তাহা স্মরণ রাখিবেন এবং ভুলিয়া যাইবেন না। খলীফা বলিলেন, আমি যখন নিজের গরজেই নসীহত প্রার্থনা করিতেছি, সুতরাং তাহা ভুলিয়া যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি গভীর মনোযোগের সহিত আপনার কথা শুনিতেছি, আপনি বলুন। খলীফার এই কথার

জবাবে আমি বলিলাম, আমার আশংকা হইতেছে যে, আপনি আমার কথা শুনিবেন বটে কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করিবেন না। আমি এই কথা বলিতেই রবী' চিৎকার করিয়া উঠিয়া তলোয়ারের বাটে হাত রাখিল। খলীফা মনসুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কি করিতেছ? ইহা ছাওয়াবের মজলিস– শাস্তির নহে। আমার প্রতি খলীফার এই সম্মানজনক আচরণে আমার মন প্রীত হইল এবং আমি প্রাণ খুলিয়া কথা বলার অনুকূল পরিবেশ পাইলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুল হইতে এবং তিনি অতিয়্যা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ايما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبلها بشكر و الا كانت حجة من الله ليزداد بها اثما و يزداد الله بها سخطا عليه ·

অর্থঃ "যেই ব্যক্তির নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন নসীহত আসে, তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত নেয়মত বটে। সে যদি উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করে, তবে তো ভাল। অন্যথায় সেই নসীহতই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে, যেন উহার কারণে তাহার গোনাহ বেশী হয় এবং আল্লাহ তাহার প্রতি বেশী অসন্তুষ্ট হন।" (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুলের নিকট হইতে এবং মাকহুল অতিয়্যা ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ايما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة

অর্থাৎ– "যেই শাসক প্রজাদের অকল্যাণকামী হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাত হারাম করিয়া দিবেন।

(ইবনে আবিদ্দুনয়া, ইবনে আ'দী)

হে আমীরুল মোমেনীন! হক ও সত্যকে অপছন্দ করার অর্থ হইল, আল্লাহকে অপছন্দ করা। কেননা, আল্লাহ সত্য। আল্লাহ পাক আপনাকে খেলাফতের দায়িত্ব দ্বারা এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা ভাগ্যবান করিয়াছেন। আল্লাহর নবীর সহিত এই নৈকট্যের কারণে আল্লাহ পাক মানুষের অন্তর আপনার প্রতি নরম করিয়া দিয়াছেন। পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল ছিলেন। উম্মতকে তিনি ভালবাসিতেন এবং উম্মতের নিকটও

তিনি প্রিয় ও প্রশংসনীয় ছিলেন। সুতরাং আপনারও কর্তব্য– সত্যের উপর আমল করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, মানুষের ত্রুটি গোপন করা, ফরিয়াদীর নিবেদন শ্রবণ করা, মজলুমের জন্য নিজের দরজা বন্ধ না করা এবং জনগণের দুঃখে দুঃখী ও তাহাদের সুখে সুখী হওয়া।

আমীরুল মোমেনীন! ইতিপূর্বে কেবল আপনার একার চিন্তা ছিল। এখন আপনার পক্ষে শুধু নিজেকে লইয়া চিন্তা করিলে চলিবে না। সকল মানুষের দায়িত্ব এখন আপনার মাথায়। আরব-আজম, মুসলিম-অমুসলিম সব আপনার সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত। সকলেই আপনার ইনসাফের প্রত্যাশী। বিচার দিবসে যদি এইসব লোক দাঁড়াইয়া আপনার বিরুদ্ধে জুলুম-নির্যাতন ও বেইনসাফীর অভিযোগ করে, তবে সেই কঠিন দিনে আপনার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখুন।

আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুলের নিকট হইতে এবং তিনি ওরওয়া ইবনে রোয়াইমের নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি খর্জুর বৃক্ষের ডাল ছিল। তিনি উহা দ্বারা মেসওয়াক করিতেন এবং মোনাফেকদিগকে সতর্ক করিতেন। এই প্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার হাতে এই ডালটি কেন যাহা দ্বারা আপনি উম্মতের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন? (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

আমীরুল মোমেনীন! এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন; যাহারা আল্লাহর বান্দাদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাহাদের পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলে, তাহাদের শহর ও জনপদগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে এবং তাহাদিগকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে, তাহাদের পরিণতি কি হইতে পারে।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি মাকহুল হইতে, তিনি জিয়াদ হইতে, তিনি হারেসা হইতে এবং হারেসা হাবীব ইবনে মুসলিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঘটনাটি হইলঃ একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দ্বারা তাহার অজ্ঞাতসারে এক বেদুঈনের গায়ে আঁচড় লাগিল। এই সময় হযরত জিবরাঈল খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে মোহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে জালেম বা অহংকারীরূপে প্রেরণ করেন নাই। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদুঈনকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি আমার নিকট হইতে (সেই আঘাতের) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। বেদুঈন বিচলিত হইয়া সহসা আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হউক। আমার দেহ আপনার সম্মুখে উপস্থিত, আপনি যদি

আপনার উপর উৎসর্গ হউক। আমার দেহ আপনার সম্মুখে উপস্থিত, আপনি যদি আমাকে প্রাণেও মারিয়া ফেলিতেন; তবুও আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম না। এই কথা শুনিয়া আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! নিজের নফসের তরবিয়ত করুন এবং আল্লাহ পাকের নিকট শান্তি প্রার্থনা করুন। এমন জান্নাতের প্রত্যাশী হউন, যাহার প্রশস্ততা আসমান-জমিনের বরাবর এবং যেই জান্নাত সম্পর্কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

لقيد قوس احدكم من الجنة خير له من الدنيا و ما فيها

অর্থাৎ– "তোমাদের মধ্যে কাহারো পক্ষে জান্নাতের এক ধনুক পরিমাণ স্থান অর্জিত হওয়া, পৃথিবী এবং উহার মধ্যস্থিত সকল কিছু অপেক্ষা উত্তম।" (ইবনে আবিদ্দুনিয়া)

হে আমীরুল মোমেনীন! দুনিয়ার রাজত্ব যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহা আপনার পূর্ববর্তীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত এবং আপনি তাহা প্রাপ্ত হইতেন না। এই রাজত্ব যখন আপনার পূর্ববর্তীদের নিকট স্থায়ী হয় নাই, সুতরাং আপনার নিকটও স্থায়ী হইবে না। আপনিকি বলিতে পারেন, আপনার পিতামহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতের কি তাফসীর করিয়াছেন–

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصَاهَا

অর্থঃ "ইহাতে যে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেয় নাই– সবই ইহাতে রহিয়াছে।" (সূরা কাহাফঃ আয়াত ৪৯)

তিনি বলিয়াছেন, এখানে ছগীরা অর্থ মুচকি হাসা এবং কবিরা অর্থ পূর্ণ হাসা। সুতরাং মুচকি হাসা ও পূর্ণ হাসারই যদি এই পরিণতি হয়, তবে হাত ও মুখের কাজের কি অবস্থা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলিতেন, যদি ফুরাত নদীর তীরে একটি ছাগল ছানাও অনাহারে মারা যায়, তবে আমার আশংকা হইতেছে, উহার জন্যও আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, যাহারা আপনার আশেপাশে এবং আপনার শহরে বসবাস করে, তাহারা যদি আপনার ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হয়, তবে উহার জবাবদিহিতা হইতে আপনি কেমন করিয়া রক্ষা পাইবেন?

আমীরুল মোমেনীন! আপনার পিতামহ নিম্নের আয়াতের কি তাফসীর করিয়াছেন, তাহা আমার জানা আছে–

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ "হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তাহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে।"

(সূরা সোয়াদঃ আয়াত ২৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক যবুর কিতাবে স্বীয় পয়গম্বর হযরত দাউদ (আঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করিয়াছেন, হে দাউদ! যখন তোমার নিকট বাদী ও বিবাদী উপস্থিত হয় এবং তোমার মন তাহাদের কোন একজনের প্রতি ঝুকিয়া যায়, তখন এইরূপ কামনা করিও না যে, তোমার সেই ব্যক্তিই যেন তাহার প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হয়। তুমি যদি এইরূপ কর, তবে আমি তোমার নবুওয়্যত ছিনাইয়া লইব। অতঃপর ভূপৃষ্ঠে তুমি আমার খলীফাও থাকিবে না এবং পয়গম্বর হওয়ার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিত হইবে।

হে দাউদ! আমার রাসূলগণের অবস্থা যেন রাখালদের মত। তাহারা রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং নরমভাবে শাসন করে।

হে মুসলমানদের আমীর! আপনি এমন এক মহান দায়িত্ব সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত যে, আসমান ও জমিনের সম্মুখে সেই দায়িত্ব পেশ করা হইলে উহারা তাহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিত। হে আমীরুল মোমেনীন! আমার নিকট এজীদ ইবনে জাবের এবং তাহার নিকট আব্দুর রহমান ইবনে ওমর আনসারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক আনসারীকে জাকাত উসুল করার কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই নিযুক্তির কয়েকদিন পরও তাহাকে মদীনায় বসবাসরত দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দায়িত্ব দেওয়ার পরও তুমি জাকাত উসুল করিতে গেলেনা কেন? তুমি কি জান না যে, এই কাজে তুমি আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের সমান ছাওয়াব পাইবে? লোকটি আরজ করিল, আপনি যাহা মনে করিয়াছেন তাহা নহে; বরং আমার নিকট এই বিবরণ পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন–

ما من دال يلي شيئا من امور الناس الا اتى به يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه لا يفكها الا عدله ليوقف على جسر من النار و لينتفض به ذالك الجسر انتفاضة تزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فان كان محسنا

نجا باحسانه و ان كان مسيئا انخرق به ذالك الجسر فيهوي به في النار سبعين خريفا ·

অর্থঃ "যেই ব্যক্তি মানুষের কোন কাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হইবে, কেয়ামতের দিন তাহার ঘাড়ে হাত বাঁধা অবস্থায় তাহাকে হাজির করা হইবে। আদল ও ন্যায় বিচার ছাড়া অন্য কিছু তাহার হাত খুলিতে পারিবে না। এই অবস্থায় তাহাকে জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হইবে। পুল তাহাকে এমনভাবে নাড়া দিবে যে, তাহার অঙ্গসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া যাইবে। অতঃপর সে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে এবং তাহার হিসাব লওয়া হইবে। যদি সে সৎ কর্মশীল হয়, তবে সৎ কর্মের কারণে সে রক্ষা পাইবে। পক্ষান্তরে সে যদি বদকার হয়, তবে পুল উহার স্থান হইতে সরিয়া যাইবে এবং সে জাহান্নামের সত্তর বৎসর দূরত্বের নীচে গিয়া পতিত হইবে। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই হাদীছ কাহার নিকট শুনিয়াছ? সে বলিল, আমি হযরত আবু জর ও হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিকট এই হাদীছ শুনিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া সেই হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উভয়ে হাদীসটির সত্যতা স্বীকার করিলেন। এইবার হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) হতাশা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, হায়! শাসনকার্যে এত অমঙ্গল থাকিলে এই দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে? হযরত আবু জর (রাঃ) বলিলেন, যেই ব্যক্তির নাসিকা কর্তিত হয় এবং চেহারা মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

আওজায়ী বলেন, আমার উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা রুমাল দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার কান্না দেখিয়া আমার চোখেও পানি আসিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম, আমীরুল মোমেনীন! আপনার প্রপিতামহ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কা, তায়েফ অথবা য়ামানের শাসন ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। উহার জবাবে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, হে চাচাজান! আপনি যদি এক নফসকে (এবাদত ও রিয়াজত দ্বারা) জীবিত রাখেন, তবে তাহা এমন রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম যাহা আপনি বেষ্টন করিতে পারিবেন না। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

প্রিয় চাচার হিতকামনা ও তাঁহার সহিত সম্পর্কের দাবীও ইহাই ছিল যে, তাঁহাকে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব গ্রহণের বিপদশঙ্কুল পথে অগ্রসর হইতে নিষেধ করা। প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, রোজ কেয়ামতে আমি আপনার কোন কাজেই আসিতে পারিব না। যখন এই

আয়াতটি নাজিল হইল– وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (অর্থঃ "আপনি নিকটতম আত্মীয়গণকে সতর্ক করিয়া দিন।" –সূরা আশশোআরাঃ আয়াত ২১৪) তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস, হযরত সাফিয়্যা এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

اني لست اغني عنكم من الله شيئا ان لي عمل و لكم عملكم

অর্থঃ আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। আমার আমল আমার জন্য উপকারী হইবে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য উপকারে আসিবে। (ইবনে আবিদ্দুনয়া)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা পরিপক্ক, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, গৃহীত সিদ্ধান্তে অটল, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি হইতে মুক্ত এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকের তিরস্কারকে ভয় করে না; এমন ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করার যোগ্য। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) আরো বলেন, শাসক চারি প্রকার–

১. যে নিজেও প্ররিশ্রম করে এবং কর্মচারীদের দ্বারাও পরিশ্রম করায়। এমন শাসক আল্লাহর পথে জেহাদাকারীদের মত এবং সে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকে।

২. দুর্বল শাসক। অর্থাৎ যেই শাসক নিজে পরিশ্রম করে বটে, কিন্তু প্রশাসনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা সে কাজ আদায় করিতে পারে না। এমন শাসক নিজের দুর্বলতার কারণেই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। তবে আল্লাহ পাক যদি রহম করেন, তবে সে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

৩. এমন অলস শাসক যে নিজে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিয়া কর্মচারী দ্বারা কাজ আদায় করে। এইরূপ শাসক নিজে একা ধ্বংস হইবে।

৪. যেই শাসক অলসতা করিয়া নিজেও কোন কাজ করে না, রাত দিন কেবল ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং কর্মচারীদিগকেও আমোদ-ফূর্তি ও বিবিধ বিনোদনে লিপ্ত রাখে; এইরূপ ক্ষেত্রে রাজা-প্রজা উভয় পক্ষই ধ্বংস হইবে।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, একবার হযরত জিবরাঈল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমি যখন আপনার নিকট আসি, তখন কেয়ামতের জন্য জাহান্নামের আগুন উত্তেজিত করা হইতেছিল (অর্থাৎ– কেয়ামত নিকটবর্তী)। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হে জিবরাঈল! জাহান্নাম সম্পর্কে আমাকে কিছু বল। হযরত জিবরাঈল আরজ

করিলেন, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের আগুন জ্বালাইবার নির্দেশ দেওয়ার পর হাজার বৎসর যাবতৎ সেই আগুন প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বৎসর জ্বালাইলে সেই আগুন পাণ্ডবর্ণ ধারণ করে। এইভাবে আরো এক হাজার বৎসর সেই আগুন জ্বালাইবার পর উহার বর্ণ কালো হইয়া যায়। অর্থাৎ– জাহান্নামের বর্ণ এখন বিভীষিকাময় অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাহান্নামের বর্ণ কালো হওয়ার কারণে উহার শিখা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং উহা নির্বাপিতও হয় না। সেই আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, জাহান্নামের একটি কীটও যদি দুনিয়ার মানুষকে দেখানো হয়, তবে উহার ভীবৎসতা দেখিয়া সমস্ত মানুষ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইবে। জাহান্নামের এক বালতি পানি যদি দুনিয়ার সমস্ত পানির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার সমস্ত পানি এমন বিষাক্ত হইয়া যাইবে যে, উহা যে পান করিবে, সেই মারা যাইবে। জাহান্নামের শিকলের একটি কড়া যদি পৃথিবীর পাহাড় সমূহের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার উত্তাপে সমস্ত পাহাড় গলিয়া অস্তিত্বহীন হইয়া যাইবে। কোন মানুষকে একবার জাহান্নামে প্রবেশ করাইবার পর যদি পুনরায় তাহাকে দুনিয়াতে আনা হয়, তবে তাহার ভীবৎস অবস্থা ও দুর্গন্ধের কারনে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করিবে।

জাহান্নামের উপরোক্ত বিবরণ শোনার পর আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে হযরত জিবরাঈলও কাঁদিলেন। পরে হযরত জিবরাঈল আরজ করিলেন, হে মোহাম্মদ! আপনার তো অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার পরও আপনি কাঁদিতেছেন কেন? জবাবে তিনি এরশাদ করিলেন, জিবরাঈল! আমি কি শোকরগুজার বান্দা হইব না? অতঃপর তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তো রূহুল আমীন ও বিশ্বস্ত আত্মা এবং আল্লাহর ওহীর আমানতদার, তুমি কাঁদিলে কেন? হযরত জিবরাঈল আরজ করিলেন, আমার আশংকা হইতেছে যে, আমার অবস্থা আবার হারুত-মারুতের মত হইয়া যায় কিনা। এই কারণে আমি আমার মর্যাদার উপর ভরসা করিতে পারিতেছি না।

মোটকথা, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ক্রন্দনের ফলে আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, হে জিবরাঈল, হে মোহাম্মদ! তোমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হওয়া এবং তোমাদিগকে আজাব দেওয়া এই উভয় বিষয় হইতে আমি তোমাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলাম। মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সকল পয়গম্বরের উপর এমন, যেমন জিবরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতাকূলের উপর।

হে আমীরুল মোমেনীন! আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, হযরত ওমর (রাঃ) আল্লাহর দরবারে এইরূপ দোয়া করিয়াছেন, আয় পরওয়ারদিগার! বাদী-বিবাদী আমার আপনজন হউক বা না হউক তাহারা আমার নিকট হাজির হওয়ার পর আমি যদি কাহারো পক্ষপাতিত্ব করি, তবে আমাকে এক মুহূর্তও সুযোগ দিও না। আমীরুল মোমেনীন! সব চাইতে কঠিন কর্ম হইল, আল্লাহর হক আদায় করা। আর আল্লাহ পাকের নিকট সবচাইতে বড় বুজুর্গী হইল তাকওয়া। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ইজ্জত পাইতে চায়, আল্লাহ পাক তাহাকে ইজ্জত দান করেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়া ইজ্জতের অধিকারী হইতে চায়, আল্লাহ পাক তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনার আহবানে সাড়া দিয়া আমি আপনাকে এই কয়টি নসীহত করিলাম। এখন আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিন– এই কথা বলিয়াই আমি প্রস্থানোদ্যত হইলে খলীফা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি এখন কোথায় যাইবেন? আমি বলিলাম, ইনশাআল্লাহ আমি এখন স্বদেশে আমার পরিবার পরিজনের নিকট যাইব। খলীফা আমাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে বহু মূল্যবান নসীহত করিয়াছেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনার নসীহত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতঃ আমি উহার উপর আমল করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আল্লাহ পাক মানুষকে সৎ কাজের তাওফীক দান করেন এবং তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী। সুতরাং আমি কেবল আল্লাহ পাকেরই সাহায্য কামনা করিতেছি এবং তাঁহার উপরই ভরসা করিতেছি। আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। আমি আশা করিতেছি, ভবিষ্যতেও আমাকে আপনার নেক দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিবেন না। উপদেশদানে যেহেতু আপনার কোন ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত নাই; সুতরাং আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ ও গৃহীত।

মোহাম্মদ ইবনে মুসইব বলেন, খলীফা মনসুর আওজায়ীকে যাবতীয় পাথেয় প্রদানপূর্বক তাঁহার সফরের আয়োজন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আওজায়ী অতীব সৌজন্যের সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এইসবে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে আমি আমার নসীহত বিক্রয় করিতে চাহি না। খলীফা মনসুর যেহেতু ইতিপূর্বেই আওজায়ীর তবীয়ত ও তাঁহার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই বিষয়ে তাহাকে আর পীড়াপীড়ি করিলেন না এবং গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত এক অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

হযরত খিজির (আঃ)-এর নসীহত

মুহাজির বর্ণনা করেন, একবার খলীফা মনসুর পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। মক্কায় অবস্থানকালে তাহার নিয়ম ছিল– প্রতিদিন গভীর রাতে তিনি হরম শরীফ চলিয়া যাইতেন। সেখানে নেহায়েত এতমিনানের সহিত তাওয়াফ ও নফল নামাজ আদায় শেষে ফজরের পূর্বেই তিনি নিজ আবাসে চলিয়া আসিতেন। কেহ জানিতেও পারিত না যে, খলীফা প্রতি রাতে মাতাফে আসিয়া তাওয়াফ ও নামাজ আদায় করিয়া যাইতেছেন। এক রাতে খলীফা তাওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি মুলতাযামের নিকট আসিয়া শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি দোয়া করিতেছে– আয় পরওয়ারদিগার! নাফরমানী ও ফেৎনা-ফাসাদে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে এবং হকদারের হক প্রাপ্তিতে জুলুম ও লালসা অন্তরায় হইয়া আছে। এই কথা শুনিয়া খলীফা দ্রুত সেই লোকটির নিকটে গিয়া মনোযোগের সহিত তাহার মোনাজাত শুনিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদের এক কোণায় গিয়া বসিলেন এবং খাদেমকে বলিলেন, মুলতাযামের সম্মুখে মোনাজাতরত ঐ লোকটিকে ডাকিয়া আন। খাদেম গিয়া লোকটিকে বলিল, তোমাকে আমীরুল মোমেনীন ডাকিয়াছেন। লোকটি হজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া খাদেমের সঙ্গে খলীফার নিকট আসিয়া হাজির হইল। খলীফা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মোনাজাতের মধ্যে তুমি যে বলিতেছিলে, ফেৎনা-ফাসাদে দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে এবং হকদারের হক প্রাপ্তিতে জুলুম ও লালসা অন্তরায় হইয়া আছে, এইসবের অর্থ কি? তোমার মুখে এইসব অভিযোগ শোনার পর হইতে আমি অন্তহীন পেরেশানী অনুভব করিতেছি। লোকটি আরজ করিল, আমীরুল মোমেনীন! আপনি যদি আমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তবেই আমি এইসব অভিযোগের মর্ম খুলিয়া বলিব, খলীফা বলিলেন, আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম, তুমি নিশ্চিন্তে সব খুলিয়া বল। এইবার লোকটি বলিল, বস্তুতঃ যেই ব্যক্তির লোভ-লালসার কারণে হকদারের হক প্রাপ্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া আছে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং আপনি। এই কথা শুনিয়া খলীফা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হতভাগা! আমার মধ্যে কি কারণে লোভ-লালসা আসিবে? দেশের যাবতীয় সম্পদ এবং ভালমন্দ সবই তো আমার করায়ত্বে। লোকটি বলিল, আপনি যাহাই বলুন না কেন, আপনার মধ্যে যেই পরিমাণ লোভ সৃষ্টি হইয়াছে, অপর কাহারো মধ্যে তাহা হয় নাই। আল্লাহ পাক আপনাকে মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার কর্তব্য ছিল, জনগণের ধর্মকর্ম ও আর্থসামাজিক অবস্থার মানোন্নয়ন এবং তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান। কিন্তু আপনি

সেই সবের ধারেকাছেও না গিয়া নিজের ভোগ-বিলাস ও সম্পদ সঞ্চয়ের ফিকিরে লাগিয়া গেলেন। আপনি নিজের ও জনগণের মাঝে ইট-সুরকির প্রাচীর, লৌহফটক ও সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করিয়া জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। রাজপ্রাসাদে আপনি বন্দী হইয়া আছেন এবং আপনার নিরাপত্তার জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহার কারণে সাধারণ মানুষ বিচারের দাবী লইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতে পারিতেছে না। রাজকর্মচারীগণকে আপনি অর্থ সংগ্রহ ও কর আদায়ের জন্য পাঠাইতেছেন। আপনার উজীর-মন্ত্রী, সহকারী ও সশস্ত্র প্রহরীদের এক বিরাট বাহিনী সর্বদা আপনাকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখে। অথচ তাহাদের কর্তব্য এমন নহে যে, আপনি কিছু ভুলিয়া গেলে তাহারা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেয় বা উত্তম কর্মে আপনাকে সহযোগিতা করে কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজে কোন ক্রুটির শিকার হইলে তাহারা আপনাকে শোধরাইয়া দেয়। বরং আপনি তাহাদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং অস্ত্র ও সওয়ারী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাইবার কাজে তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়া দিয়াছেন। আপনার এইসব অসাধু লোকেরা দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জনগণের উপর চরম নির্যাতন চালাইতেছে। রাজদরবারে সাধারণ মানুষের আগমন আপনি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রহরীদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যেন নির্দিষ্ট কতক ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অপর কাহাকেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া না হয়। আপনি প্রহরীদিগকে এমন বলিয়া দেন নাই যে, কোন মজলুম ও বিপন্ন নাগরিক যদি আর্জি লইয়া আমার নিকট আসিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। আপনার প্রশাসনের সর্ককর্মা, উজীর-মন্ত্রী, সহচর ও মোসাহেবগণ যখন দেখিল যে, স্বয়ং খলীফা বিনা অধিকারে বাইতুল মালে সঞ্চিত মুসলমানদের সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করিতেছেন, তখন তাহারাও সরকারী সম্পদ লুটপাট ও খেয়ানতে জড়াইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, আমাদের শ্রমে চালিত খলীফা যদি খেয়ানত করিতে পারেন, তবে আমরা পারিব না কেন? অতঃপর এই কায়েমী স্বার্থবাদীগণ লুটপাটের এই সর্গরাজ্য স্থায়ী রাখার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিল যে, তাহাদের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের কোন প্রতিনিধি যেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে না পারে এবং কাহারো পক্ষ হইতে যেন কোনরূপ অভিযোগ আপনার গোচরে না আসে। প্রশাসনের কোন ব্যক্তি যদি আপনার যথার্থ হিতকামনায় রাষ্টের কোন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করিয়াছে তবে সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বার্থান্বেষী মহলটি তাহার বিরুদ্ধে বানোয়াট অভিযোগ তুলিয়া তাহাকে আপনার বিরাগ ভাজন করিয়া কর্মচ্যুত করিয়া ছাড়িয়াছে।

আপনার প্রশাসনের এইসব শীর্ষকর্মকর্তাদের কীর্তিকলাপের কারণে নিম্নস্তরের কর্মচারীগণ তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলে। আর সুযোগমত উপঢৌকন দিয়া তাহাদিগকে হাত করিয়া রাখে যেন সাধারণ জনগণের উপর তাহারাও নির্বিচারে জুলুম করিয়া বৈষয়িক সুবিধা আদায় করিতে পারে। অনুরূপভাবে সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিগণও আমলাদিগকে ঘুষ দিয়া হাতে রাখে যেন তাহারাও প্রশাসনের পক্ষ হইতে বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারে। এইভাবেই গোটা দেশ অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতনে ভরিয়া গিয়াছে এবং দুর্নীতিবাজ আমলাগণ আপনার ক্ষমতার অংশীদার হইয়া গিয়াছে।

কোন মজলুম যদি ফরিয়াদ লইয়া আপনার নিকট আসিতে চেষ্টা করে, তবে সে যেন কোন অবস্থাতেই আপনার নিকট আসিতে না পারে উহার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আপনি যখন সাধারণ মানুষের অবস্থা পরিদর্শনে যান, তখনও যেন কোন ফরিয়াদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ লইয়া আপনার নিকট ঘেঁষিতে না পারে উহার উপরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ করা হইয়াছে।

সাধারণ মনুষের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য আপনি একজন পরিদর্শক নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিদর্শকের উপরও আমলাদের পক্ষ হইতে এমন চাপ সৃষ্টি করিয়া রাখা হইয়াছে যে, উহার ফলে ইচ্ছা থাকিলেও সে আমলাদের ভয়ে আপনার নিকট মুখ খুলিতে সাহস পাইতেছে না। আপনি জনগণের অবস্থা পরিদর্শনে যাওয়ার পর কোন মজলুম যদি হিম্মত করিয়া আপনার নিকট আসিয়া কোন অভিযোগ করিয়াছে, তবে আপনার আমলাদের নির্দেশে সিপাহীগণ বেদম প্রহারে তাহার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। অথচ এইসবই আপনি নীরবে-নির্বিকারে দেখিয়া যাইতেছেন। না জালেমের জুলুমের প্রতিকার করিতেছেন, না মজলুমের উপর ইনসাফ কায়েম করিতেছেন। এক্ষণে আপনিই বলুন, ইসলাম এবং উহার নীতিমালার আর কিছুই কি অবশিষ্ট আছে? না আমরা মুসলমানরূপে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য আছি। ইতিপূর্বে বনু উমাইয়্যার শাসন ছিল। তখন রাজ দরবারে কোন মজলুম আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফরিয়াদ শোনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে কোন বিচারপ্রার্থী আসিলে আমলাগণ ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

হে আমীরুল মোমেনীন! একবার আমি চীন সফরে গিয়াছিলাম। তখন সেই দেশের সরকার প্রধান খুব ন্যায় পরায়ন ছিলেন। আমি রাজ প্রাসাদে যাওয়ার পর লোকদের নিকট শুনিতে পাইলাম, বাদশাহ বধির হইয়া গিয়াছেন

এবং তিনি কিছুই শুনিতে পান না। শ্রবণশক্তি হারাইবার কারণে বাদশাহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন এবং এই কারণে মাঝে-মধ্যে তিনি কান্নাকাটিও করিতেন। একদিন বাদশাহর উজীর তাহাকে কাঁন্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি শ্রবণশক্তি হারাইয়াছি, ইহাতে আমার কোন আক্ষেপ নাই। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে। কিন্তু আমার আক্ষেপ হয়, যখন আমি কল্পনা করি যে, আমার মজলুম জনগণ হয়ত ফরিয়াদ লইয়া আমার দরবারে চিৎকার করিতে থাকিবে; কিন্তু আমি উহার কিছুই শুনিতে পাইব না। অতঃপর তিনি নিজেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, শ্রবণশক্তি হারাইয়াছি তাহাতে কি হইয়াছে? আমার দৃষ্টিশক্তি তো এখনো বিদ্যমান। উহা দ্বারাই আমি কাজ চালাইতে পারিব। তোমরা রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দাও, এখন হইতে যাহারা কোনরূপ অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের শিকার হইবে, তাহারা যেন লাল পোশাক পরিধান করে। মজলুম ব্যতীত অপর কেহ লাল পোশাক পরিধান করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থার পর তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা জনগণের অবস্থা পরিদর্শনে বাহির হইতেন এবং লাল পোশাক দেখিয়াই মজলুমদিগকে সনাক্ত করিতে পারিতেন। অর্থাৎ এইভাবেই তিনি বধির হওয়ার পরও মজলুম জনগণ যেন ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত না হয়, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

আমীরুল মোমেনীন! একবার ভাবিয়া দেখুন, চীনের বাদশাহ ছিলেন একজন অমুসলিম। তাহার পরকালের ভয় ছিল না। তথাপি তিনি নিজ প্রজাদের প্রতি কতটা সদয় ছিলেন এবং ইনসাফ কায়েমে কতইনা আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি তো একজন মুসলমান এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখেন। আপনি শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বংশধর। এতসব বৈশিষ্ট্যের পরও আপনি মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করিতেছেন না। তদুপরি আপনি নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে দেশ ও জাতির উপরে স্থান দিতেছেন এবং কেমন করিয়া বিপুল ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া যায় উহার ফিকিরে লাগিয়া আছেন। আপনি যে কি কারণে এত সম্পদ জড়ো করিতেছেন তাহা বোধগম্য নহে। আপনি যদি বলেন যে, আমার আওলাদ-ফরজন্দ ও ভবিষ্যত বংশধরের জন্য এই সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি, তবে উহার জবাবে আমি বলিব, ভবিষ্যতের ব্যবস্থা তো আল্লাহ পাক নিজেই করিয়া রাখিয়াছেন। দেখুন, একটি মানবশিশু যখন দুনিয়াতে আসে তখন সে একেবারেই রিক্ত হস্তে আসে এবং এই সময় সে পৃথিবীর একটি কানা কড়িরও মালিক থাকে না। আর পৃথিবীতেও এমন কোন বস্তু থাকে না যার কোন মালিক নাই। অথচ এই অবস্থায়ও আল্লাহ পাক শিশুটিকে তাহার আবশ্যকীয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করেন না এবং যখন যাহা প্রয়োজন হয় উহার ব্যবস্থা করিয়া দেন। আপনি যদি বলেন যে, আমার ক্ষমতাকে সুসংহত ও স্থায়ী করার জন্যই আমি

সম্পদ সঞ্চয় করিতেছি, তবে আমি বলিব, এই ক্ষেত্রেও আপনার উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনার পূর্ববর্তী বহু শাসক অর্থ-কড়ি ও সোনা-দানার বিপুল সম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সম্পদ দ্বারা কি তাহারা নিজেদের ক্ষমতা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে? মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পর অর্থবল-জনবল কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। আপনি ভাবিয়া দেখুন, আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা করিলেন, তখন আপনাকে বিপুল সম্পদের মালিক বানাইলেন। ইতিপূর্বে আপনার এবং আপনার ভ্রাতাগণের সম্পদ কম ছিল– এই অজুহাতে আপনাকে সম্পদ হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই।

আপনি যদি বলেন যে, বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা উন্নত জীবন যাপনের উদ্দেশ্যেই আমি সম্পদ সঞ্চয় করিতেছি, তবে স্মরণ রাখিবেন– পার্থিব সম্পদের কারণে আপনি জীবনে শান্তি লাভ করিবেন, এমন আশা করা অমূলক। বরং একমাত্র নেক আমলের মাধ্যমেই আপনি ইহকাল ও পরকালের স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারেন।

হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কোন অপরাধীকে মৃতুদণ্ড অপেক্ষা অধিক কোন শাস্তি দিতে পারেন কি? খলীফা বলিলেন, না। লোকটি বলিল, তবে আপনি এমন রাজ্য দিয়া কি করিবেন যার ক্ষমতা আপনাকে দেওয়া হইয়াছে? আল্লাহ পাক তো কোন নাফরমান বান্দাকে মৃত্যুদণ্ড দেন না। বরং তিনি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আপনি সেই দিনের কথা কল্পনা করুন, যেই দিন আল্লাহ পাক আপনার এই রাজক্ষমতা ছিনাইয়া লইবেন এবং প্রতিটি কর্মের হিসাব দানের জন্য সামনে দাঁড় করাইবেন। সেই কঠিন দিনে আপনার আজিকার এই রাজক্ষমতা ও ধনৈশ্বর্য কিছুই কাজে আসিবে না।

উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা মনসুর অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর কান্না প্রশমন হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার যদি জন্মই না হইত, আমি যদি উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি না হইতাম। অতঃপর তিনি নসীহতকারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এখন তুমি আমাকে বল, আমি কি উপায়ে আমার দেশ ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করিব এবং কেমন করিয়াইবা স্বার্থন্বেষী আমলাদের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিব। আমি তো চতুর্দিকে কেবল বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর লোকই দেখিতে পাইতেছি। এমন লোক কোথায় পাইব, যাহারা নিঃস্বার্থভাবে এবং আমানতদারীর সহিত আমার কাজে সহযোগিতা করিবে? লোকটি বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ দ্বীনদার ও পরহেজগার লোকদিগকে আপনার কাছে টানুন। তাহারা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবে এবং রাজ্য পরিচালনায় আমানতদারীর সহিত আপনাকে সহযোগিতা করিবে। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপ নিঃস্বার্থ পরহেজগার লোক কাহারা? লোকটি বলিল, হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

খলীফা বলিলেন, ওলামায়ে কেরাম আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে। সে বলিল, আপনার গর্হিত আচরণের কারণেই তাহারা আপনাকে বর্জন করিয়া চলে। আজ হইতে আপনি শাহী ফটক উন্মুক্ত করিয়া সশস্ত্র প্রহরা হ্রাস করার নির্দেশ দিন। প্রয়োজনের সময় আম-খাস নির্বিশেষ সকলেই যেন আপনার শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয় সেই ব্যবস্থা করুন। জালেমের নিকট হইতে মজলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন এবং জালেমকে তাহার জুলুম হইতে নিবৃত্ত করুন। হালাল উপায়ে সম্পদ আহরণ করুন এবং ইনসাফের সহিত তাহা প্রকৃত প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করুন। আপনি যদি আমার এই পরামর্শের উপর আমল করিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আজ যাহারা আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া আছে, কাল তাহারাই আপনার সান্নিধ্যে আসিবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করিবে। খলীফা দোয়া করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমি যেন এই ব্যক্তির পরামর্শের উপর আমল করিতে পারি, আমাকে সেই তাওফীক দান কর। এমন সময় হরম শরীফের মোআজ্জিন আসিয়া জানাইল যে, নামাজের সময় হইয়াছে। খলীফা নামাজের তৈয়ারী করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সেই লোকটি কোথায় চলিয়া গেল। নামাজ শেষে খলীফা সেই লোকটিকে না পাইয়া রাজ রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন, এই মাত্র যেই লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তাহাকে খুঁজিয়া আন। যদি তাহার সন্ধান করিতে না পার, তবে তোমার গরদান উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

খলীফার নির্দেশ পাইয়া রাজরক্ষী সেই লোকটির সন্ধানে বাহির হইল। বহু খোঁজাখুঁজির পর এক উপত্তকায় গিয়া দেখিল, সেই লোকটি গভীর মনোযোগের সহিত নামাজ পড়িতেছে। ছালাম ফিরাইবার পর রক্ষী নিকটে গিয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন? লোকটি বলিল, হাঁ! আমি আল্লাহকে ভয় করি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি তাঁহাকে চিনেন? লোকটি বলিল, হাঁ! আমি আল্লাহকে চিনি, এইবার রাজরক্ষী বলিল, আপনি যদি আল্লাহর পরিচয় ও মারেফাত হাসিল করিয়া থাকেন এবং তাহাকে ভয়ও করেন, তবে আমার সঙ্গে চলুন। আমীরুল মোমেনীন আপনাকে তলব করিয়াছেন। তিনি শপথ করিয়াছেন, আমি যদি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারি, তবে তিনি আমাকে হত্যা করিবেন। লোকটি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, এখন তো আমি যাইতে পারিব না। তবে আমি না যাওয়ার কারণে তিনি তোমাকে হত্যা করিবেন না। রাজরক্ষী উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি তাহাকে প্রশ্ন করিল, তুমি কি পড়িতে পার? সে বলিল, না আমি পড়িতে পারি না। অতঃপর লোকটি থলি হইতে একটি কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, এইটি তোমার পকেটে রাখিয়া দাও। ইহাতে প্রশস্ততার দোয়া লিখিত আছে।

রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল, প্রশস্ততার দোয়া কি? লোকটি বলিল, এই দোয়া শহীদগণ ব্যতীত অপর কাহাকেও দেওয়া হয় না। রাজরক্ষী বলিল, হে শায়েখ! আপনি যখন আমার উপর এতই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তো আমাকে সেই দোয়াটি বাতাইয়া দিন এবং উহার গুনাগুণও বলিয়া দিন। লোকটি বলিল, যেই ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করিবে–

- তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে,
- তাহার জন্য স্থায়ী শান্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে,
- তাহার দোয়া কবুল হইবে,
- তাহাকে পর্যাপ্ত রিজিক দেওয়া হইবে,
- তাহার ইচ্ছা পূরণ হইবে,
- শত্রুর উপর জয়ী হইবে,
- আল্লাহ পাকের নিকট সে ছিদ্দিকীনগণের মধ্যে গণ্য হইবে এবং–
- তাহার শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হইবে।

দোয়াটি এই–

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء و علوت بعظمتك على العظماء و علمت ما تمت ارضك كعلمك بما فوق عرشك و كانت وساوس الصدور كالعلانية عندك و علانية القول كالسر في علمك و انقاد كل شيء بعظمتك و خضع كل ذي سلطان سلطانك و صار امر الدنيا و الاخرة كلمة بيدك اجعل لي من كل هم امسيت فيه فرجا و مخرجا ·

اللهم ان عفوك عن ذنوبي و تجاوزك عن خطيئتي و سترك على قبيح عملي اطمعني ان اسئلك ما لا استوجبه لما قصرت فيه ادعوك امنا و اسئلك منانسا انك المحسن لي و انا المسيء الى نفسي فيما بيني و بينك تتور الى بالنعم و ابتغض اليك بالمعاصي و لكن الثقة بك حملتني على الجرأة عليك فعند بفضك و احسانك على انك انت التواب الرحيم *

অর্থঃ "আয় আল্লাহ! আপনি নিজ আজমতে সকল পবিত্র হইতে পবিত্র এবং নিজ আজমত দ্বারা সকল মহান অপেক্ষা মহান। ভূগর্ভের অবস্থা আপনি এমনভাবে জ্ঞাত, যেমন আরশের উপরের অবস্থা সম্পর্কে আপনি পরিজ্ঞাত। অন্তরের গোপন কথা আপনার নিকট প্রকাশ্য কথার মত এবং প্রকাশ্য কথা আপনার নিকট গোপন কথার মত (অর্থাৎ– গোপন ও প্রকাশ্য সবই আপনার নিকট সমান)। আপনার আজমত ও মহত্ত্বের সামনে সকল কিছু হীন এবং

সকল সুলতান তুচ্ছ আপনার সালতানাতের সম্মুখে। ইহ-পরকালের সকল কিছু আপনার করায়ত্ব। আমাকে এমনসব দুর্ভাবনা হইতে মুক্তি দিন যাহাতে আমি লিপ্ত।

আয় আল্লাহ! আপনি তো আমার গোনাহ্ ক্ষমা করিয়াছেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করিয়াছেন এবং আমার মন্দ কাজগুলি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন – এই বিষয়গুলি আমাকে আশান্বিত করিয়াছে যে, আমি আপনার নিকট এমন বিষয় প্রার্থনা করিব– আপন গোনাহের কারণে আমি যাহা পাওয়ার যোগ্য নহি। আমি অবাধে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করেন, আর আমি নিজের উপর অন্যায় করি। আপনি নেয়মত দান করিয়া আমাকে বন্ধু বানান, আর আমি গোনাহ্ করিয়া আপনাকে অসন্তুষ্ট করি। কিন্তু আপনার উপর আস্থা ও ভরসা, সাহস প্রদর্শনে আমাকে উৎসাহিত করে। আমার উপর আপনার ফজল ও এহ্সান আগের মতই অব্যাহত রাখুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।"

রাজরক্ষী বলে, আমি পত্রটি লইয়া যথা সময় খলীফার দরবারে হাজির হইলাম। তাহাকে ছালাম করিতেই তিনি মাথা তুলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। অতঃপর মৃদ হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন, মনে হয় তুমি যাদু জান। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহর শপথ, আমি যাদু জানি না। অতঃপর আমি আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলাম। ঘটনার বিবরণ শোনার পর খলীফা বলিলেন, লোকটি তোমাকে যেই কাগজ দিয়াছে, তাহা বাহির কর। আমি পকেট হইতে সেই কাগজটি বাহির করিয়া খলীফার হাতে দিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি আজ বড় বাঁচিয়া গেলে। অন্যথায় আজ তোমাকে অবশ্যই হত্যা করা হইত। অতঃপর তিনি সেই কাগজটি নকল করাইয়া রাখিলেন এবং আমাকে দশ হাজার দেরহাম বখশিশ দিলেন। পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিতে পার, সেই লোকটি কে? আমি এই বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে খলীফা বলিলেন, তিনি হযরত খিজির (আঃ)।

খলীফা হারুনুর রশীদের প্রতি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সতর্ক নসীহত

আবু এমরান জওফী (রহঃ) বলেন, খলীফা হারুনুর রশীদ খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তৎকালীন দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেম তাহাকে মোবারকবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে রাজ দরবারে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। খলীফাও রাজকোষ উজাড় করিয়া তাহাদিগকে বিপুল পরিমাণে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করেন। খলীফা হারুনুর রশীদ খেলাফত লাভের পূর্বে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম ও সূফী-সাধকগণের সাহচর্যে সময় কাটাইতেন

এবং বিশেষতঃ সেই যুগের প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে তাহার গভীর সম্পর্ক ছিল। খলীফা হওয়ার পর সেই যুগের প্রায় সকল আলেম সাক্ষাত করিয়া তাহাকে মোবারকবাদ জানান বটে, কিন্তু হযরত সুফিয়ান ছাওরী উহা হইতে বিরত থাকেন। অথচ খলীফা এই সময় আন্তরিকভাবে হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সাক্ষাত কামনা করিতেছিলেন এবং তাহার অসাক্ষাত খলীফার নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হইতেছিল। পরে তিনি হযরত সুফিয়ানের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর বান্দা হারুনুর রশীদ আমীরুল মোমেনীনের পক্ষ হইতে তাহার ভাই সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মুনজিরের নামে–

আম্মা বা'দ, জনাবে মোহতারাম! আপনার ইহা ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আল্লাহ পাক মোমেন বান্দাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সম্পর্ককে নিজের জন্য নিজের সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, আমি আপনার সঙ্গে যেই সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়াছি তাহা ছিন্ন করি নাই এবং আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বেরও অবসান ঘটে নাই। বরং আন্তরিকভাবে এখনো আমি আপনার প্রতি উত্তম অনুরাগ ও গভীর আস্থা পোষণ করিতেছি। আমার মাথায় যদি খেলাফতের গুরু দায়িত্ব অর্পিত না হইত, তবে অতি আদবের সহিত আমি আপনার খেদমতে আসিয়া হাজির হইতাম। কেননা, আমার অন্তর আপনার প্রতি অন্তহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মোহাব্বতে পরিপূর্ণ।

হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি হয়ত অবগত হইয়াছেন যে, আপনার এবং আমার বন্ধু মহলের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে আমাকে মোবারকবাদ জানাইতে আসে নাই। আমি তাহাদের জন্য বাইতুল মাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের মধ্যে মূল্যবান উপঢৌকন বিতরণ করিয়াছি এবং উহার ফলে আমি যথার্থ আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনি যেহেতু এখনো আগমন করেন নাই, এই কারণে আপনার প্রতি আমার মনের গভীর অনুরাগ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই আজ পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন মোমেনের সঙ্গে সাক্ষাত করা, তাহার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা এবং উহা স্থায়ী রাখার কি ফজিলত তাহা আপনার ভাল করিয়াই জানা আছে। সুতরাং আমার এই পত্র আপনার হাতে পৌঁছাইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া আপনি আমার এখানে তাশরীফ আনয়ন করুন।

পত্র লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর খলীফা উপস্থিত সকলের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। অর্থাৎ পত্রটি হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নিকট কে বহন করিয়া লইয়া যাইবে এই বিষয়ে সকলের মতামত জানিতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত সুফিয়ান ছাওরীর উষ্ণ স্বভাব ও জালালী তবিয়ত সম্পর্কে যেহেতু সকলেই অবগত ছিল,

এই কারণে কেহই পত্র লইয়া যাইতে সাহস করিল না। অবশেষে খলীফা ওব্বাদ তালেকানী নামে এক দারোয়ানকে দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করিলেন। যাওয়ার সময় খলীফা তাহাকে বিশেষভাবে হেদায়েত দিয়া বলিলেন, কুফা নগরীতে গিয়া তুমি মানুষের নিকট ছওর গোত্রের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিবে। সেই গোত্রে গিয়া হযরত সুফিয়ান ছাওরীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার সাক্ষাত পাইবে। সেখানে তুমি যাহা যাহা দেখিবে ও শুনিবে গভীর মনোযোগের সহিত তাহা স্মরণ রাখিবে যেন ফিরিয়া আসিয়া তাহা হুবহু আমার নিকট বর্ণনা করিতে পার। খলীফার পত্রবাহী দূত কুফার ছওর গোত্রে গিয়া লোকদের নিকট হযরত সুফিয়ান ছাওরীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। লোকেরা তাহাকে জানাইল, তিনি মসজিদে অবস্থান করিতেছেন। দূত বলে, আমি সেই মসজিদের দিকে আগাইলাম, কিন্তু আমি মসজিদের নিকটবর্তী হইতেই হযরত সুফিয়ান ছাওরী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ!! আমি এমন আগন্তুক হইতে পানাহ চাহিতেছি, যাহার আগমন অনিষ্টকর বৈ কল্যাণকর নহে। হযরত সুফিয়ানের এইসব কথার প্রভাবে আমি বিচলিত হইয়া পড়িলাম। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, আমার সওয়ারী মসজিদের সম্মুখে থামিয়াছে এবং আমি সেখানেই অবতরণ করিব তখন তিনি নামাজ পড়িতে শুরু করিলেন। অথচ তখন কোন নামাজের সময় ছিল না। আমি মসজিদের ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সেই বুজুর্গের সহচরগণ তাহার সম্মুখে এমনভাবে বসিয়া আছে যেন একদল চোর হাকিমের সম্মুখে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শাস্তির অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে ছালাম করিলাম, কিন্তু তাহারা মুখে কিছুই না বলিয়া কেবল হাতের ইশারায় ছালামের জবাব দিল। আমি সেখানে ঠায় দাঁড়াইয়া রহিলাম, কেহ আমাকে বসিতেও বলিল না। ঘটনার শুরু হইতেই আমি বিব্রত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু এই পর্যায়ে আমার মনে রীতিমত ভীতির সঞ্চার হইল। অবস্থা দৃষ্টে ইতিপূর্বেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, যেই বুজুর্গ নামাজ পড়িতেছেন তিনিই প্রখ্যাত সূফি সাধক হযরত সুফিয়ান ছাওরী। আমি সাবধানতার সহিত খলীফার পত্রটি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। কিন্তু উহার প্রতি নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁৎকাইয়া উঠিলেন এবং এমনভাবে আত্মরক্ষা করিলেন যেন সম্মুখে বিষধর সর্প দেখিয়াছেন। নামাজ শেষে তিনি হাতে জামার প্রান্ত জড়াইয়া পত্রটি হাতে লইলেন এবং পিছনে উপবিষ্ট সহচরগণের দিকে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তোমাদের কেহ পত্রটি পাঠ করিয়া দেখ। আমি তো এমন বস্তুতে হাত লাগানো হইতে আল্লাহর পানাহ চাহিতেছি– যাহা কোন জালেম স্পর্শ করিয়াছে।

শায়েখের সহচরদের একজন পত্রটিকে এমন ভয়ে ভয়ে খুলিল যেন উহার অভ্যন্তরে বিষধর সাপ মুখ হা করিয়া বসিয়া আছে এবং সুযোগ পাইলেই উহা মানুষকে দংশন করিবে। যাহাই হউক, সে পত্রটি পাঠ করিয়া শোনাইলে শায়েখ

বলিলেন, পত্রটির অপর পৃষ্ঠায় উহার জবাব লিখিয়া দাও। সহচরগণ বলিল, হে আবু আব্দুল্লাহ! ইহা স্বয়ং খলীফার পত্র। সুতরাং একটি ভাল কাগজে উহার জবাব লেখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি বলিলেনঃ না, আমি যেইভাবে বলিয়াছি সেইভাবেই লিখ। জালেমের পত্রের জবাব উহার অপর পৃষ্ঠায় লেখাই যথেষ্ট। সে যদি এই কাগজটি হালাল উপায়ে সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে উহার ছাওয়াব পাইবে। অন্যথায় উহার জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাদের নিকট এমন কোন বস্তু থাকা উচিৎ নহে যাহা কোন জালেম স্পর্শ করিয়াছে। কেননা, উহার ফলে আমাদের দ্বীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠির জবাবে কি লিখিব? তিনি বলিলেন, লিখ–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

গোনাহগার বান্দা সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনে মুনজির ছাওরীর পক্ষ হইতে প্রতারিত হারুনুর রশীদের প্রতি, যার ঈমানের স্বাদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে অবগত করার জন্য পত্র লিখিতেছি যে, আমি তোমার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছি এবং এখন হইতে আমি তোমার শত্রুতে পরিণত হইয়াছি। কেননা, তুমি আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছ যে, তুমি বাইতুল মালের সম্পদ এমন ব্যক্তিদের পিছনে উজাড় করিয়া দিয়াছ, যাহারা উহার প্রকৃত প্রাপক নহে। তুমি কেবল উহা করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই; বরং আমাকেও উহার সাক্ষী বানাইয়াছ। অথচ আমি তোমার নিকট হইতে অনেক দূরে ছিলাম এবং তোমার সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র অবগতি ছিল না। কিন্তু এখন তোমার চিঠির মাধ্যমে তোমার প্রকৃত অবস্থা আমরা জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি এবং আমার সেইসব সহচর যাহারা তোমার পত্র পাঠ করিয়াছে রোজ কেয়ামতে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

হারুন! রাজকোষের সম্পদের যাহারা প্রকৃত মালিক তাহাদের অমতে তুমি ঐ সম্পদ অপচয় করিয়াছ। তোমার এই কাজে কোন্ দলটি খুশী হইয়াছে? ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যাহাদিগকে দান করা হয় তাহারা? না জাকাতের কর্মচারী, আল্লাহর পথে জেহাদকারী, মুসাফির, হাফেজ-আলেম, বিধবা, এতীম ইত্যাদি কোন্ শ্রেণীটিকে তুমি খুশী করিতে পারিয়াছ? তুমি কি মনে কর যে, দেশের প্রজাসাধারণ তোমার এই কাজটি সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছে?

হে হারুন! এখন তুমি বিচার দিবসের হিসাবের জন্য প্রস্তুত হও। শীঘ্রই তোমাকে রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হইতে হইবে এবং সেখানে তোমার প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। কেননা, তুমি এলেম, এবাদত, তেলাওয়াত এবং আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতের ধারাবাহিকতা ছিন্ন

করিয়া দিয়াছ এবং নিজেদের জন্য জালেমদের নেতৃত্ব পছন্দ করিয়াছ।

হে হারুন! তুমি রেশমী বস্ত্র পরিধান করতঃ রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিতেছ এবং দরজায় পর্দা ঝুলাইয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছ। তোমার ফটকে এমন জালেম প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছ যাহারা নিরীহ প্রজাদের উপর নির্বিচারে অত্যাচার করে। এইসব প্রহরীগণ নিজেরা শরাব পান করে এবং অপর কেহ শরাব পান করিলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করে। নিজেরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং অপর কেহ এই কর্মে লিপ্ত হইলে তাহার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে তাহারা নিজেরা চুরি করে এবং অপর কেহ চুরি করিলে তাহার হস্ত কর্তন করে। অর্থাৎ অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যেন শরীয়তের বিধিবিধান তোমার ও তোমার প্রশাসনের জন্য প্রযোজ্য নহে এবং উহা কেবল তোমার প্রজাদের জন্যই নাজিল হইয়াছে।

হে হারুন! সেই দিন তোমার কি দশা হইবে যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে–

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ

অর্থঃ "একত্রিত কর জালেমদিগকে এবং তাহাদের দোসরদিগকে।"

(সূরা আসসাফফাতঃ আয়াত ২২)

হে হারুন! তোমাকে এবং তোমার সাহায্যকারী জালেমদিগকে ঘাড়ের সহিত হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির করা হইবে। তোমার ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কিছু এই বন্ধন খুলিতে পারিবে না। তোমার সহযোগী জালেমগণ তোমার চতুর্দিকে থাকিবে। তুমি দলপতি হইয়া তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

হে হারুন! আমি যেন তোমার পরিণতি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি– রোজ কেয়ামতে তোমার ঘাড় ধরিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির করা হইয়াছে। তোমার নেকীসমূহ তুমি অপরের পাল্লায় দেখিতে পাইতেছ এবং তোমার নিজের পাল্লায় নিজের গোনাহের সঙ্গে অপরের গোনাহসমূহও দেখিতে পাইতেছ। সেই কঠিন বিপদের দিনে তোমার চতুর্দিকে একের পর এক বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে।

হে হারুন! তোমার একজন সত্যিকার হিতাকাংখী হিসাবে আমি তোমাকে নসীহত করিয়া যাইতেছি; আমার কথাগুলি তোমার অন্তরে গাঁথিয়া রাখিও এবং উহার উপর আমল করিও। প্রজাসাধারণের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করিও এবং উম্মতের ব্যাপারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করিও। মনে রাখিও, শাসন ক্ষমতা যদি কোন স্থায়ী বিষয় হইত, তবে কোনভাবেই তুমি তাহা প্রাপ্ত হইতে না। এই শাসন ক্ষমতা যেমন তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট স্থায়ী হয় নাই, তদ্রূপ তোমার নিকট হইতেও একদিন তাহা ছিনাইয়া লওয়া হইবে। অর্থাৎ এই মর্তলোকের অবস্থাই

এমনি বিবর্তনশীল যে, এখানে কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। বুদ্ধিমান লোকেরা এই ক্ষণস্থায়ী জীবন হইতে পরকালের অনন্ত সফরের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লয়। আবার এক শ্রেণীর লোক ইহকাল-পরকাল উভয় জাহানেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হে হারুন! আমি তোমাকে সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যেই দেখিতেছি, যাহারা নিজেদের দুনিয়াও শেষ করিতেছে এবং আখেরাতও বরবাদ করিতেছে। আমার এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া সেই অনুযায়ী আমল করিলে তুমি লাভবান হইবে। এখন আমি শেষ করিতেছি। ওয়াস্‌সালাম।

ওব্বাদ তালেকানী বলে, হযরত সুফিয়ান ছাওরীর পত্র লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি উহা আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন। পত্রটি ভাঁজ করিয়া খামের ভিতর ভরিয়া দিলেন না এবং উহাতে সিল মোহরও লাগাইলেন না। যাহাই হউক, আমি পত্রটি লইয়া রওনা হইলাম। হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নসীহত ইতিপূর্বেই আমার অন্তরে ক্রিয়া শুরু করিয়াছিল। আমি কুফার বাজারে আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম, ভাই সকল! এক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট হইতে পলাতক ছিল। এখন সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। আপনারা কেহ তাহাকে ক্রয় করিবেন কি? আমার এই ঘোষণার পর কতক লোক দেরহাম লইয়া আমার নিকট হাজির হইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এইসবে আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমার কেবল একটি জুব্বা ও একটি কম্বল চাই। লোকেরা আমাকে জুব্বা ও কম্বল আনিয়া দিল। আমি রাজকীয় পোশাক খুলিয়া সেইগুলি পরিধান করিলাম। আমার সঙ্গের অস্ত্রটি ঘোড়ার পিঠে রাখিয়া দিলাম এবং ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া খালি পায়ে হাঁটিয়া রওনা হইলাম।

রাজমহলে পৌঁছাইবার পর লোকেরা আমার অদ্ভূত পোশাক, খালি পা, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পদব্রজে আগমন ইত্যাদি অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। অনেকে তো আমাকে লইয়া দস্তুর মত তামাশা করিতে লাগিল। পরে খলীফাকে আমার উপস্থিতির সংবাদ দেওয়া হইল এবং আমি যথা সময় তাঁহার খেদমতে হাজির হইলাম। আমার উপর নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খলীফার চেহারায় ভাবান্তর দেখা দিল। কিছুক্ষণ পর তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, আক্ষেপ, শত আক্ষেপ! দূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইল আর প্রাপক বঞ্চিত রহিল। এই দুনিয়া, দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা এবং উহার শান-শওকত দ্বারা আমার কি লাভ হইবে? ক্রমে সকল কিছুই তো একদিন শেষ হইয়া যাইবে এবং আমাকে একা দুনিয়া হইতে বিদায় হইতে হইবে।

ওব্বাদ তালেকানী বলে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী আমাকে যেইভাবে চিঠি দিয়াছিলেন, চিঠিটি আমি হুবহু সেইভাবেই খলীফার হাতে দিলাম। খলীফা পত্রটি পাঠ করিতে করিতে অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং ভয়-আশংকা ও দুর্ভাবনায় তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

খলীফার দরবারে উপস্থিত জনৈক সভাসদ আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! এই পত্র দ্বারা সুফিয়ান ছাওরী আপনাকে অপমান করিয়াছে। এই বেআদবীর জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। আপনি যদি হুকুম করেন, তবে আমরা এখুনি তাহাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আপনার দরবারে আনিয়া হাজির করিব– যেন তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্য সকলেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে যেন আর কেহ আমীরুল মোমেনীনের সঙ্গে বেআদবী করার সাহস না পায়।

খলীফা হারুনুর রশীদ লোকটির দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, যেই ব্যক্তি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইবে, সে অত্যন্ত দুর্ভাগা। তোমরা হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে এখনো চিনিতে পার নাই। তিনি একজন উঁচু মানের আলেম এবং শরীয়তের যথার্থ পাবন্দ। আমি তাঁহার কাজে বাঁধা দিয়া নিজের পরিণতি খারাপ করিতে চাহি না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে খলীফা হারুনুর রশীদ হযরত সুফিয়ান ছাওরীর উপরোক্ত পত্রটি সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন এবং প্রতি নামাজের পর উহা পাঠ করিতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করিয়াছেন।

যেই ব্যক্তি প্রতি কাজে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের নফসের প্রতি নজর রাখে আল্লাহ পাক তাহার উপর রহম করুন। পরকালে মানুষের প্রতিটি কাজেরই হিসাব লওয়া হইবে। দুনিয়াতে যেই ব্যক্তি নেক আমল করিয়াছে, পরকালে সে উহার বিনিময় লাভ করিবে। আর বদকারকে অবশ্যই তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

খলীফার প্রতি বাহলুল মজনূনের নসীহত

আব্দুল্লাহ ইবনে মেহরান বলেন, একবার খলীফা হারুনুর রশীদ হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় কয়েক দিনের জন্য কুফায় যাত্রা বিরতি করেন। পরে তথা হইতে যাত্রা করিলে কুফাবাসীগণ তাহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত আগাইয়া আসে। বাহ্‌লুল মজনূনও সেখানে উপস্থিত ছিল। এই সময় শহরের বালকরা তাহাকে লইয়া তামাশা করিতেছিল। পরে খলীফার সওয়ারী আসিলে বালকরা সরিয়া যায়। বাহলুল উচ্চ স্বরে খলীফাকে ডাকিয়া বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! খলীফা জবাব দিলেন, লাব্বাইক হে বাহলুল! বাহলুল বলিল, আমি হাদীস শুনিয়াছি আয়মান ইবনে নায়েল হইতে, তিনি কুদামা ইবনে আব্দুল্লাহ আমেরী হইতে। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়াছি। তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এই সময় কোনরূপ ধাক্কাধাক্কি, মারধর কিংবা হটো-পথছাড় ইত্যাদি হৈ-হল্লার কিছুই ছিল না।

আমীরুল মোমেনীন! এই সফরে আপনার পক্ষে অহংকার ও শান-শওকত প্রদর্শনের পরিবর্তে বিনয় অবলম্বন করা উত্তম।

বর্ণনাকারী বলেন, বাহলুল মজনূনের উপরোক্ত নসীহত শোনার পর খলীফা হারুনুর রশীদ কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, বাহলুল! আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, আমাকে আরো কিছু নসীহত কর। বাহলুল বলিল, উত্তম হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ যাহাকে ধনসম্পদ ও দৈহিক সৌন্দর্য দান করিয়াছেন, সে যদি ঐ সম্পদ আল্লাহর পথে দান করে এবং দৈহিক সৌন্দর্যে সংযমী হয়, তবে আল্লাহ পাক তাহার নাম বিশেষ ব্যক্তিদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া লন। খলীফা হারুনুর রশীদ বাহলুলের এই হেকমত পূর্ণ কথায় প্রীত হইয়া তাহাকে কিছু হাদিয়া দিতে চাহিলেন। বাহলুল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, ইহা আপনি যাহার নিকট হইতে লইয়াছেন তাহাকে ফেরৎ দিয়া দিন, ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। খলীফা বলিলেন, বাহলুল! তোমার কোন করজ থাকিলে বল, আমি তাহা পরিশোধ করিয়া দিব। বাহলুল বলিল, কুফার আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, ঋন পরিশোধের জন্য ঋণ করা ঠিক নহে। অবশেষে খলীফা বলিলেন, তবে তোমার নিয়মিত চলার জন্য আমি কিছু ভাতা নির্ধারণ করিয়া দেই। বাহলুল আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি এবং আপনি উভয়ই আল্লাহ তায়ালার পরিবারভুক্ত। সুতরাং ইহা কোনক্রমেই সম্ভব নহে যে, তিনি আপনার কথা স্মরণ রাখিবেন আর আমাকে ভুলিয়া যাইবেন। বাহলুলের এই জবাব শুনিয়া খলীফা আর কিছুই বলিলেন না এবং নীরবে যাত্রা শুরু করিলেন।

এক যুবকের নসীহত ও শাহাদাত

আবুল আব্বাস হাশেমী ছালেহ ইবনে মামুনের নিকট বর্ণনা করেন, একদিন আমি হারেস মোহাসেবীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি নিয়মিত নিজের নফসের পাপ-পুণ্যের হিসাব গ্রহণ করেন কি? জবাবে তিনি বলিলেন, হাঁ এক সময় করিতাম বটে। আমি আরজ করিলাম, এখন করেন না কেন? তিনি বলিলেন, এখন আমি নিজেকে গোপন করি। অতঃপর তিনি এক বিস্ময়কর ঘটনার বর্ণনা দিয়া বলেন, একদিন আমি আমার নির্জন কক্ষে বসা ছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে এক সুদর্শন যুবক আগমন করিল। সে আমাকে ছালাম দিয়া একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, আমি একজন পর্যটক। আমি এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া বেড়াই, যাহারা নির্জনে আল্লাহর এবাদতে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আমি আপনাকে দৃশ্যতঃ কোন এবাদতে নিমগ্ন দেখিতে পাই নাই। আপনি কোন্ ধরনের এবাদত করেন? আমি জবাব দিলাম; আমার উপর কোন বালা-মুসীবত আসিলে আমি

তাহা প্রকাশ না করিয়া গোপন রাখি এবং যাহা উপকারী ও কল্যাণকর তাহা হাসিল করি। আমার এই জবাব শুনিয়া যুবক বিকট স্বরে চিৎকার দিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল, পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত এই সুবিশাল পৃথিবীর অপর কেহ এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। আমি বলিলাম, আল্লাহওয়ালাদের নিয়ম হইল, তাহারা নিজেদেরকে অপরের নিকট হইতে গোপন রাখেন এবং আল্লাহর নিকটও দোয়া করেন যেন মানুষের নজর হইতে তাহাদিগকে গোপন রাখা হয়। সুতরাং তুমি কেমন করিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে পারিবে? আমার এই কথা যুবকের উপর পূর্বাধিক ক্রিয়া করিল এবং সে বিকট স্বরে চিৎকার দিয়া জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। এই অজ্ঞান অবস্থায় ক্রমাগত দুই দিন সে আমার এখানে পড়িয়া রহিল। দুই দিন পর যখন হুশ হইল, তখন মল-মুত্রে তাহার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র নাপাক হইয়া গিয়াছিল। আমি তাহাকে নূতন কাপড় দিয়া বলিলাম, এই কাপড় আমি নিজের কাফনের জন্য রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার নিজের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিতেছি। তুমি পাক-সাফ হইয়া এই কাপড় পরিধানপূর্বক বিগত দুই দিনের কাজা নামাজ আদায় কর।

যুবক গোসল করিয়া নামাজ আদায়ের পর এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কোথায় যাইবে? সে এই কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়া বলিল, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। আমি কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে রওনা হইলাম।

যুবক আমাকে লইয়া খলীফা মামুন রশীদের দরবারে গিয়া হাজির হইল। সে খলীফাকে ছালাম করিয়া বলিল, হে জালেম! আমি যদি তোমাকে জালেম না বলি, তবে আমি নিজেই জালেম। আমি তোমার বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা করা হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি কি এতদ্‌সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করিবে না যে, তিনি জমিনের উপর তোমাকে মানুষের শাসক নিযুক্ত করিয়াছেন? ..... অর্থাৎ এইভাবে কঠোর ভাষায় খলীফাকে কতক নসীহত করার পর সে তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইল। আমি দরজার পাশেই বসা ছিলাম। খলীফা যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে এবং এখানে কেন আসিয়াছ? যুবক বলিল, আমি একজন পর্যটক। আমি পূর্ববর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের অবস্থা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি (যে, তাহারা কেমন করিয়া আমীর ও শাসক শ্রেণীকে নসীহত করিতেন।) কিন্তু আমার মধ্যে তাহাদের (সেই) আমল বিদ্যমান ছিল না। এই কারণে আমি তোমাকে নসীহত করার এরাদা করিয়া তাহা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি।

হারেস মোহাসেবী বলেন, যুবকের এই দুঃসাহস দেখিয়া খলীফা তাহাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সেই কাফনের পোশাকের সঙ্গেই যুবককে

তৎক্ষণাত হত্যা করা হইল। পরে তাহার লাশ বাহির করিয়া শহরে নিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল– এই লাশের কোন ওয়ারিশ থাকিলে তাহারা আসিয়া লাশ গ্রহণ করিতে পারে। আমি এই ঘোষণা শোনার পরও লাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস করিতে পারি নাই। অবশেষে যখন কেহই লাশ গ্রহণ করিল না, তখন শহরের গরীব মুসলমানগণ যুবকের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করিল। কাফন-দাফনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমি শরীক ছিলাম। কিন্তু কাহাকেও এই কথা জানিতে দেই নাই যে, এই পরদেশী যুবক জীবনের শেষ ভাগের কিছু সময় আমার সঙ্গে কাটাইয়াছে এবং সেই সুবাদে সে আমার পরিচিত ছিল। যাহাই হউক, যুবকের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর আমি গোরস্তানের পার্শ্ববর্তী মসজিদে চলিয়া গেলাম। যুবকের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কারণে আমার মন খুবই পেরেশান ছিল। আমি ক্লান্ত দেহে মসজিদের এক কোণে শয়ন করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে নিদ্রা নামিয়া আসিল। অতঃপর স্বপ্নযোগে আমি সেই যুবককে বেহেশতী হুর পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। যুবক আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে হারেস! আল্লাহর কসম, আপনি সেইসব ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য, যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে কিন্তু উহার ফল গোপন রাখে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেইসব লোকেরা এখন কোথায়? সে বলিল, তাহারা এখুনি এখানে আসিবে। একটু পরই আমি দেখিতে পাইলাম, কতক সওয়ারীর একটি কাফেলা আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? তাহারা জবাব দিল, "নিজেদের অবস্থা গোপনকারী"। অতঃপর তাহারা যুবকের দিকে ইশারা করিয়া বলিল, এই যুবক তোমার কথায় প্রভাবিত হইয়াছিল এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিল। পরে এই অপরাধে (?) তাহাকে হত্যা করা হয়। এখন এই যুবক আমাদের সঙ্গী এবং তাহার হত্যাকারীর 'দুর্ভাগ্য' আল্লাহর গজবকে আহবান করিতেছে।

হযরত আবুল হাসান নূরীর ঘটনা

মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম মুকরী বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আবুল হাসান নূরী খুব কম কথা বলিতেন এবং অহেতুক কর্ম পরিহার করিয়া চলিতেন। একান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না এবং মানুষের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেন না। তবে কোন অন্যায় ও গর্হিত কর্ম দেখিলে উহাতে বাঁধা দিতেও তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করিতেন না। একদিন তিনি নদীর তীরে বসিয়া অজু করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি নৌকায় অনেকগুলি মটকা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রত্যেকটি মটকার গায়ে "লুতফ" শব্দটি লেখা ছিল। যেহেতু কোন বস্তু বা পণ্যের নাম 'লুতফ' আছে বলিয়া তাহার জানা ছিল না, এই কারণে তিনি

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মটকাগুলিতে কি আছে? মাঝি বলিল, মটকায় কি আছে তাহা জানিয়া আপনার কি হইবে? আপনি নিজের কাজ করুন। মাঝির কুশলী জবাব শুনিয়া হযরত নূরীর সন্দেহ আরো বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমি এমনিই জানিতে চাহিতেছি। তুমি যদি আমাকে বলিয়া দাও– মটকায় কি আছে, তবে আমার একটি অজানা বিষয় জানা হইবে, অথচ তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। মাঝি বলিল, ভারি মজার কাণ্ড তো; মনে হইতেছে, আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি অতি আগ্রহী এক সুফী মানুষ। আপনার যদি এতই আগ্রহ থাকে তবে শুনুন। ঐ মটকাগুলিতে শরাব আছে এবং তাহা খলীফা মু'তাজাদের জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। হযরত নূরী জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে কি সত্যি শরাব আছে? মাঝি বলিল, হাঁ! উহাতে সত্যিই শরাব আছে বটে। শরাবের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত নূরীর মনে চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি মাঝিকে বলিলেন, তোমার পাশে রক্ষিত ঐ মুগুরটি আমার হাতে দাও। এই কথা শুনিয়া মাঝি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার চাকরকে বলিল, মুগুরটি তাহার হাতে দাও; দেখি তিনি কি করেন। হযরত নূরী মুগুরটি হাতে পাওয়ামাত্র নৌকায় উঠিয়া একে একে সবগুলি মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং একটি মাত্র মটকা অক্ষত রাখিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন।

ঘটনার আকস্মিতায় মাঝি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া আশেপাশের লোকেরা ছুটিয়া আসিল। কিন্তু এতক্ষণে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসক ইবনে বিশর আফলাহ অকুস্থল পরিদর্শনে আসেন। ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি হযরত নূরীকে গ্রেফতার করিয়া খলীফা মুতাজাদের দরবারে চালান করিলেন। খলীফা মু'তাজাদ সম্পর্কে এইরূপ প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি আগে তরবারী চালনা করেন এবং পরে কথা বলেন। এই কারণে সকলেরই নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, খলীফা হযরত নূরীকে হত্যা না করিয়া ছাড়িবেন না।

হযরত আবুল হাসান নূরী বলেন, আমাকে যখন খলীফার দরবারে হাজির করা হইল, তখন খলীফা একটি লৌহনির্মিত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার হাতেও ছিল একটি লৌহদণ্ড। তিনি আমার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করার পর রাশভারী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আমি একজন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এই দায়িত্ব কে দিয়াছে? আমি বলিলাম, যিনি আপনাকে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়াছেন। আমার এই জবাব শোনার পর খলীফার মাথা নত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাণ্ড করিলে কেন? আমি বলিলাম, আপনার মঙ্গলের জন্য। তিনি উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে আমি বলিলাম, খলীফাকে যেই পরিমাণ অনিষ্ট হইতে রক্ষা

করা আমার পক্ষে সম্ভব– সেই পরিমাণ কর্ম সম্পাদন করা আমি আমার কর্তব্য মনে করিয়াছি। সে মতে শরাবের মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা আমার ক্ষমতার ভিতর ছিল বিধায় আমি সেইগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলি। খলীফা এইবারও নীরবে মাথা নত করিলেন। মনে হইল যেন তিনি আমার কথাগুলির যথার্থতা পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অক্ষত মটকাটির ভিতরও তো শরাব ছিল, সেইটি ভাঙ্গিলে না কেন? এইবার আমি বলিলামঃ হে আমীরুল মোমেনীন! আমি যখন প্রথমে মটকা ভাঙ্গিতে অগ্রসর হই, তখন আমার মন আল্লাহ পাকের জালাল ও প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আমি ছিলাম পরকালে আল্লাহ পাকের নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে আচ্ছন্ন। সেই সময় আমার মনে এমন ভীতির উদ্রেক হয় নাই যে, এইগুলি খলীফার মটকা এবং আমার এই আচরণে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন। অর্থাৎ সেই সময় আমি সর্বপ্রকার পার্থিব ভয়-ভীতি হইতে মুক্ত ছিলাম এবং সেই কাজে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁহার নির্দেশ পালনই ছিল আমার লক্ষ্য। এই কারণেই আমি মটকাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলার সাহস করিতে পারিয়াছি। কিন্তু যখন শেষ মটকাটি ভাঙ্গার জন্য মুগুর উত্তোলন করি, তখন আমার মনে এই অহংকার আসিল যে, "আমি তো স্বয়ং খলীফার মটকা ভাঙ্গিয়া ফেলার দুঃসাহস করিতে পারিয়াছি"। আমার মনে এই অহংবোধ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার হাত গুটাইয়া লই। অর্থাৎ সেই সময়ও যদি আমার মনে পূর্ববৎ অবস্থা বিদ্যমান থাকিত, তবে ঐ একটি মটকা কেন, যদি সমস্ত পৃথিবীও শরাবের মটকায় পরিপূর্ণ থাকিত, তবে সেই সমুদয় মটকাও আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম এবং এই ক্ষেত্রে আমি কোন মানবীয় শক্তির কিছুমাত্র পরওয়া করিতাম না।

হযরত নূরী বলেন, আমার উপরোক্ত বক্তব্যের পর খলীফা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যাও, এখন হইতে তোমাকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই কাজে কেহই তোমাকে বাধা দিবে না। খলীফার এই কথার জবাবে আমি বলিলাম, আমীরুল মোমেনীন! এখন হইতে আর তো আমি এই কাজ করিব না। কেননা, ইতিপূর্বে আমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করিয়াছি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর এখন তাহা করা হইবে আপনার নির্দেশে। আমার এই কথায় যেন খলীফা অনেকটা দমিয়া গেলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে এখন তুমি কি করিতে চাও? আমি বলিলাম, আমি কিছুই করিতে চাই না। আমাকে কেবল নিরাপদে যাইতে দিন, খলীফা আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবুল হাসান নূরী খলীফার দরবার হইতে বাহির হওয়ার পর সরাসরি বসরা নগরী চলিয়া যান এবং সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। খলীফা মু'তাজাদের ইন্তেকালের পর তিনি পুনরায় বাগদাদ ফিরিয়া আসেন।

উপরে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের কতক ঘটনা উল্লেখ করা হইল। এইসব ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহওয়ালাগণ পরিপূর্ণ এখলাসের সহিত এই কাজ করিয়াছেন এবং এই কাজে তাহারা পার্থিব লোভ লালসার কিছুমাত্র পরওয়া করেন নাই। আল্লাহ পাকের রহমতই ছিল তাহাদের একমাত্র ভরসা। এই কারণেই তাহারা প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নির্ভিকচিত্তে অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই কাজে জীবনের উপর কোনরূপ ঝুঁকি আসিলে উহাকে তাহারা শাহাদাতের সৌভাগ্য মনে করিয়াছেন। এই এখলাসের কারণেই তাহাদের কথায় তাছীর হইয়াছে এবং কঠিন হইতে কঠিন প্রাণও তাহাদের নসীহত কবুল করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা হইল, পার্থিব লোভ-লালসা যেন আলেমদের মুখে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। এখন তাহারা হক কথা না বলাই নিরাপদ মনে করিতেছে। আর বলিলেও তাহাদের কথায় কোন কাজ হইতেছে না। কেননা তাহাদের কথার সহিত অন্তরের অবস্থার কোন মিল নাই। দেশের শাসকবর্গ যখন খারাপ হয় তখন উহার প্রভাবে প্রজাসাধারণও বিপথগামী হয়। আর শাসকবর্গ খারাপ হয় আলেমগণ খারাপ হওয়ার কারণে। আলেমগণের অন্তরে যখন ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের লিপ্সা প্রবল হয়, তখনই তাহাদের নৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তো দেখা যাইতেছে, দেশের শাসক ও প্রজা খারাপ হওয়ার মূলে আলেমগণ। আলেমগণ খারাপ হইলে উহার প্রভাবে শাসক শ্রেণী খারাপ হইবে এবং শাসক শ্রেণীর নৈতিক বিপর্যয় ঘটিলে উহার কুপ্রভাবে দেশের প্রজাসাধারণও বিপথগামী হইবে। যেই ব্যক্তির অন্তরে দুনিয়ার মোহাব্বত প্রবল হইবে সেই ব্যক্তি (নৈতিক শক্তির অভাবে) একজন সাধারণ মানুষকেও আদেশ-নিষেধ করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে আমীর ও শাসক শ্রেণীকে আদেশ-নিষেধ করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের সকলকে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।